ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্য্যটক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৯ সাল পৌষ
মূল্য—দেড় টাকা

ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত। শ্যামসুন্দর প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

পৃথিবীতে যত যুদ্ধ এবং অভ্যুত্থান হয়েছে সবটাই কিছুনা কিছু মানুষকে উন্নত করেছে কিন্তু ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পড়লে দেখা যায় বিপ্লবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি এবং কেন মানুষ বিপ্লবের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়। সেজন্যই ফ্রান্স বিপ্লবের জন্মস্থান। এমন দেশ নিশ্চয়ই দেখতে ইচ্ছা হয়। আমি কিন্তু সেরূপ কোনও ইচ্ছা নিয়ে ফরাসী দেশ ভ্রমণ করতে যাই নি। ইংলণ্ডের পথে ফরাসীদের দেশ, অতিক্রম করতে হবেই অতএব পথে যা আসে দেখলে ক্ষতি কি ?

বেলজিয়ম্ এবং হলেণ্ডে বর্ণবৈষম্য বেশ অনুভব করি। ফ্রান্সে এই দুষ্ট ব্যাধির নামগন্ধ অনুভব না করতে পেরে বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছিলাম। কেন ফরাসীরা কালো লোককে সমাজিক সমান অধিকার দেয় ? ফরাসী দেশের চারিদিকে যতগুলি দেশ রয়েছে কোথাও কালো লোক সমান ব্যবহার পায় না, অথচ ফরাসীদেশে পা বাড়ালেই একেবারে পরিবর্তন অনুভব হয়। পরিবর্তন কিরূপ বুঝবার জন্য বলছি, বেলজিয়ম্ সীমান্ত পর্য্যন্ত আমার সংগে কেউ করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয় নি। যেই ফরাসী সীমান্তে পা দিলাম অমনি কাষ্টম অফিসার হাত বাড়িয়ে দিয়ে করমর্দ্দন করলেন। ফরাসীদেশে পা দেবা মাত্র বুঝলাম কোনও অজানিত বন্ধু করমর্দন করে বলছে "বন্ধু এত দিন ছিলে কোথায়, এস ঘরে যাই। এত উদারতা এরা পেল কোথা হতে তা কি বিবেচ্য বিষয় নয় ? চিন্তা করেছিলাম, আলাপ আলোচনা করেছিলাম, পণ্ডিত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সবাই বলছিলেন "ফরাসী দেশের বৈজ্ঞানিক বিদ্রোহের প্রচণ্ড অগ্নিতে অনেক কিছু দুষ্ট, নিকৃষ্ট, ভ্রষ্ট পুড়ে ছাই হয়েছে।

বুঝতে পেরেছিলাম রিফর্মইজম্ কাপুরুষের অপচেষ্টা, বিপ্লব বৈজ্ঞানিকের প্রাণের উদ্যম। বিপ্লব দীর্ঘজিবী হউক।

গ্রন্থকার
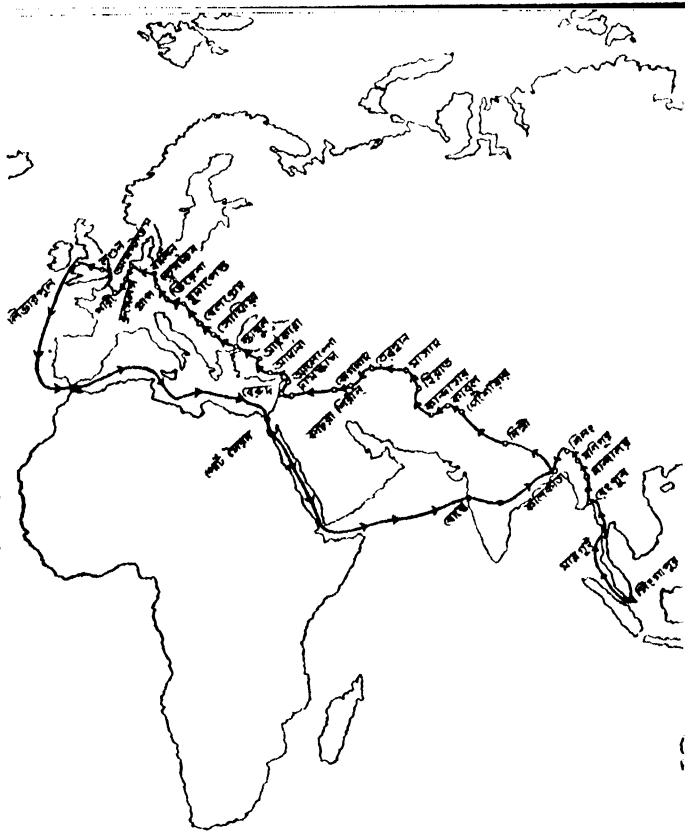
মানচিত্রে ভূপর্য্যটক রামনাথ বিশ্বাসের দ্বিতীয় বারের ভ্রমণপথ দেখান হয়েছে। ১৯৩৩ খৃঃঅঃ জানুয়ারী মাসের প্রথমভাগে তিনি সিংগাপুর হতে রওয়ানা হয়ে, ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করেই কলিকাতায় ফিরে আসতে বাধ্য হন।

ফ্রান্সে ভারতীয় ভূপর্য্যটক

প্যারীর পথে

'ফ্রান্স' শব্দ সম্মোহনকারী। এমন অনেক ভারতবাসী আছেন, যাঁরা 'ফ্রান্স,' 'প্যারী' এসব শব্দ শোনা মাত্র ধারণা করেন, ফ্রান্সই পৃথিবীর স্বর্গরাজ্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত এই ধারণা অনেকের মনে জাগ্রত ছিল। আমিও মনে করতাম, 'ফরাসী দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে বিজলী বাতি ব্যবহার হচ্ছে। ফ্রান্সে কিবা দিন কিবা রাত সকল সময়ই হয় সূর্য্যের আলো নয় ইলেকট্রিক আলো আছে। সুখের বিষয় ইউরোপের বুলগেরিয়া যুগস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, চেকো-শ্লাভাকিয়া, জার্মানী, হলেণ্ড এবং বেলজিয়াম প্রভৃতি দেশ ফ্রান্সে পৌছাবার পূর্বেই, ভ্রমণ করে ছিলাম, সেজন্তে ফ্রান্স সম্বন্ধে যত আজগুবী ধারণা সবই চলে গিয়েছিল। এই আজগুবি কথার পেছনে ছিল আমাদের দেশ থেকে যারা সমুদ্রপথে প্রথম ইউরোপ ভ্রমণ করতে গিয়েছিলেন এবং ভোগ বিলাস চরিতার্থ করেছিলেন, তাদের ভ্রমনকাহিনী পড়ে। বাস্তবিক পক্ষে ফ্রান্স এবং বর্তমান ধনতন্ত্রবাদী রাষ্ট্রগুলির পার্লামেণ্টারী সিস্টেমে আত্ম প্রকাশ করার সুযোগ সুবিধা উনিশ শত সালের শেষের দিকে ভিত্তি স্থাপন করে ছিল। সেই সংবাদ আমাদের দেশের লোক রাখত না। যারা রাখতেন তাদের সংখ্যা পাঁচ অঙ্গুলীর একটি অথবা দুটিতেই গুনতে পারা যায়।

রুশিয়া এবং চীনে যে বিপ্লব হয়েছে তার অগ্রদূত ফ্রান্স। অবশ্য ধারা ভিন্নরকমের হতে পারে কিন্তু পথপ্রদর্শক যে ফ্রান্স তাতে কোন ভুল নাই। সেই মহাবিপ্লবের জন্ত ফ্রান্স পৃথিবীর সাধারণ লোকের

কাছে চিরবরেণ্য। আমরা সে কথা কখনও ভুলতে পারি না, কিন্তু দুঃখের বিষয় হ'ল, পথপ্রদর্শক ফ্রান্সআজও ধনতন্ত্রবাদীদের পদানত।

বেলজিয়মের সীমান্তের সব চেয়ে বড় সহর ম্যন্ পেরিয়ে আসার পরেই পুলিশের কড়াকড়ি বেশ মালুম হয়েছিল। মেজিনো লাইনের আশেপাশেও তেমন কড়াকড়ি টের পাই নি। এদিকে পুলিশের এত উৎপাতের কারণ মোটেই বুঝতে পারি নি। পুলিশ আমাকে দাঁড়াতে বলত, তারপর পাস্‌পোর্ট দেখত। পাপপোর্ট দেখা হলে কত টাকা সংগে আছে জিজ্ঞাসা করত। বুদ্ধি ক'রে পাঁচ পাউণ্ডের একখানা নোট পাস্‌পোর্টের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলাম। সেই নোট দেখানো মাত্র পুলিশ পথ ছেড়ে দিত। এরা কিন্তু বেলজিয়ান্ পুলিশ এবং তখনও আমি বেলজিয়মের মধ্যেই ছিলাম। এদের জিজ্ঞাসা করতাম, "তোমাদের কি হ'ল হে? এত বাড়াবাড়ি কেন?" ইংলিশেই কথা বলতাম, তারা বুঝত, কিন্তু উত্তর দিত না, শুধু হাসত। আমি বলতাম, "তোমরা হাসছ, কিন্তু জান না সাইকেল থেকে ওঠা-নামা করতে শরীরের কত রক্ত জল করতে হয়?" তবুও তারা হাসত। বাস্তবিক একা পথ চলতে যেমন আনন্দ তেমনি মতিভ্রমও হয়।

ভুলে গিয়েছিলাম, স্পেনে জোর গণ্ডগোল আরম্ভ হয়েছিল। অনেক বিদেশী সেদিকে জাল পাস্‌পোর্ট নিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল। ইউরোপের সর্বত্র জাল পাস্‌পোর্টের প্রচলন ছিল। আমাদের দেশে সেরকম জাল পাসপোর্টের এখনও দরকার হয় নি, না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যখন দরকার হবে তখন কারো উপদেশের অপেক্ষায় জাল পাস্‌পোর্ট তৈরী বন্ধ হবে না।

ইউরোপে জাল পাসপোর্টের কিরকম প্রচলন, প্যারী নগরীতে থাকার

সময়ে একজন নরউইজিয়ান্ আমাকে দেখিয়েছিলেন। নরউইজিয়ান্ একজন দুর্দান্ত লোক। তাঁকে কেউ ভদ্রলোক বলত না। আমি তাঁকে 'ভদ্রলোক' বলতাম এবং তাঁর কাজের প্রশংসা করতাম। আমাদের দেশের মাহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য করেছিলেন। তাঁর লোকবল, খ্যাতি এবং অন্যান্য অনেক গুণ থাকার জন্যে বৃটিশ সরকার যদিও তাঁকে জেলে পাঠাত, কিন্তু তাঁর ওপর কোন অত্যাচার করতে সাহস করত না। এই ভদ্রলোকও আইন অমান্য করতেন এবং মনের বাসনা পূর্ণ করার জন্য দেশ দেশান্তরে বেড়াতেন। পাস্‌পোর্ট-আইন অমান্য করার জন্য ইনি অনেকবার জেলে গিয়েছিলেন। জেলে নির্য্যাতিত হয়েছিলেন এবং নির্য্যাতন ভোগ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে অনেক রকমের উপায়ও উদ্ভাবণ করেছিলেন।

ম্যান্ সহর থেকে তের কিলোমিটার গেলেই ফরাসীর দেশ কিন্তু এই তের কিলোমিটার যেন শেষ হতে চাচ্ছিল না! উচু নীচু পাহাড়ে পথ, উপরন্তু বার বার পুলিশের খোঁজ এবং তল্লাসীর জন্যে ঐ তের কিলোমিটার পথ চলতেই আমার তিন ঘণ্টা কেটে গিয়েছিল। সীমান্তে পৌছানোর পর ফরাসী পুলিশ দস্তুর মত খোঁজ এবং তল্লাসী করল। পুলিশে পাস্‌পোর্ট সিল করল না দেখে জিজ্ঞাসা করলাম "এটা ত বৃটিশ সাম্রাজ্য নয়, পাস্‌পোর্টে সিলমোহর করা হল না কেন?' কাষ্টম অফিসার শুধু "পাকৃতি" বলেই বিদায় দিয়েছিল।

যাদের কাছে বৃটিশ পাস্‌পোর্ট থাকত তারা ফ্রান্স, লুক্‌সেমবুর্গ, বেলজিয়ম, হলেণ্ড, জার্মানী, স্কেণ্ডেনেভিয়া, পোলেণ্ড চেকোস্লাভাকিয়া, এবং অষ্ট্রিয়া পর্য্যন্ত বিনা 'ভিসা'তেই ভ্রমণ করতে পারত, পাস্‌পোর্টের ভিসা নেওয়া ব্যয়সাধ্য। এই ব্যয় ভার হতে সাধারণ লোককে অব্যাহতি দেবার জন্য ভিসা প্রথা পশ্চিম ইউরোপে প্রত্যাখান করা হয়েছিল।

বর্তমান আইনের পরিবর্তন হয়েছে। তবুও বৃটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে যে সমস্ত দেশ আছে, সেই দেশগুলির পক্ষে বৃটিশ পাস্‌পোর্টের দ্বারা মিত্র রাজ্যগুলিতে যে সুবিধা পাওয়া যেত সেই সুবিধা বর্তমানেও পাওয়া যাচ্ছে বলেই শুনতে পাচ্ছি।

ফ্রান্সে "পাকৃতি" শব্দের অর্থ নানা রকমের। শব্দটি যখন কর্কশ স্বরে উচ্চারণ করা হয় তখন "যা বা" বুঝায়। যখন কোমল স্বরে উচ্চারণ করা হয় তখন "বান" বুঝায়। ফ্রান্সে অবজ্ঞা করেই আমাকে পাকৃতি বলা হ'ত তাতে আমার কোন সন্দেহ ছিল না।

জার্মানী এবং ফ্রান্সের মধ্যে মিত্রতা ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য উভয় রাষ্ট্র প্রস্তুত হচ্ছিল। তবুও জার্মানী ফ্রান্সের কি ক'রে মিত্র বা "এলাই" এটা নিশ্চয়ই জানবার বিষয়; সেই মিত্রতার মানে আমি জানতাম। আজ পর্য্যন্ত পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা পূর্ব ইউরোপের সবাইকে ইউরোপীয়ান্ বলে স্বীকার করে না যেমন বুল-গেরিয়ান্, ইটালিয়ান্, গ্রীসিয়ান্, হংগেরিয়ান্, ক্রটিয়ান্, শ্লোভাকিয়ান্, জর্জিয়ান্, ইউক্রেনিয়ান্ ইত্যাদি। রাশিয়াতে শ্বেত রুশিয়া নামে একটি প্রদেশ আছে, সেই প্রদেশের লোককে পশ্চিম ইউরোপের লোক ইউরোপীয়ান্ ব'লে স্বীকার করত।

শ্বেত রুশিয়া, পোলেণ্ড. জার্মানী চেকোশ্লাভাকিয়া ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, হলেণ্ড, বেলজিয়াম ফ্রান্স, এবং গ্রেট বৃটেন—এই কয়টি দেশই পূর্বকালে এবং বর্তমানেও ইউরোপ নামে পরিচিত। যদিও পোপ্ একদা এই দেশগুলিতে রাজত্ব চালাতেন, যদিও পর্তুগালের সংগে বৃটিশ রাজবংশের নিকট বৈবাহিক সম্বন্ধ, তবুও ইটালী এবং স্পেনকে ইউরোপীয়ান্ বলে সকলে স্বীকার করত না। এই দুটি দেশও পূর্বদেশের অন্তর্ভুক্ত। এসব কথা কোনও বই-এ আজ পর্যন্ত লেখা হয় নি.

ভবিষ্যতেও লেখা হবে না। এসব গোপন কথা জানতে হ'লে সারা ইউরোপে পর্যটন এবং লোকের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা না করে জানা যায় না। কথা হল, কার এত মাথা ব্যথা হবে এসব বিষয় জানার জন্য? ভিক্ষা করে ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলাম সেজন্যই এত গুহ্য কথাও জানতে পেরেছিলাম। বিত্তশালী পর্য্যটক এসব কথা কোন মতেই জানতে পারবে না।

পশ্চিম ইউরোপের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হলে ভিসার দরকার হ'ত না, পাস্‌পোর্ট থাকলেই চলত। এমন কি যদি কোনও এশিয়াবাসীর কাছে বৃটিশ পাসপোর্ট থাকত তবে উল্লিখিত দেশগুলিতে বিনা ভিসাতেই এক দেশ হতে অন্যদেশে যেতে পারত। আমার কাছে বৃটিশ পাস্‌পোর্ট ছিল সেজন্যই ভিসার দরকার হ'ত না।

ফরাসী সীমান্ত অতিক্রম করার পর বাভাল (Baval) নামে একটি ছোট্ট গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং অনেকগুলি হোটেল দ্বারা সজ্জিত। সুখের বিষয় গ্রামের এমন একটি হোটেলে থেকেছিলাম যে হোটেলের অনেকেই ইংলিশ বলতে পারত। হোটেলে ছিল পারিবারিক। এখানে খাওয়া এবং থাকার স্থান পাওয়া যেত।

ফ্রান্সে এসেছি, ফরাসীদের সংগে থাকব, কথা বলব এবং তাদের আচার ব্যবহার জানবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব এটাই ছিল ইচ্ছা। ভাবছিলাম এটাই ফরাসী হোটেল, কারণ গ্রামের মধ্যে যত হোটেল ছিল তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাহাড়ের দিকে মুখ-করা। বারান্দাতে নানা রকমের ফুলগাছ এবং সেখানে কোন দুর্গন্ধ মোটেই ছিল না। শুধু থাকবার চার্জই বার ফ্রাংক্ এবং প্রত্যেক মিলের জন্য দশ থেকে বার ফ্রাংক্ এবং সেই সংগে কাফি এবং রুটি-মাখনের জন্যে

পঞ্চাশ সেন্তিম্ ক'রে দিতে হ'ত। অতএব এটা একটা উচ্চশ্রেণীর হোটেল বলতেই হবে। দ্বিতীয়ত যে মেয়েটি আমার সংগে কথা বলত তাকে আমার চোখে ভালই দেখাত, তবুও কোথায় যেন কি গলদ ছিল, মন খুলে কেউ কথা বলত না।

বিকাল বেলা মেয়েটি যখন তার ছোট ভাইবোনদের নিয়ে আমার সংগে দেখা করতে এল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম : অন্যান্য যারা এখানে বাস করেন, তারা সবাই কি ফরাসী? এদের মধ্যে জার্মান কিম্বা ইটালীয়ান্ কি কেউ নাই?

এখানে আমরা ছাড়া সকলেই ফরাসী?

তোমরা তবে কোন জাত?

আমাদের পূর্বপুরুষ নাকি ইহুদী ছিলেন, সেজন্যে আমাদের 'ইহুদী' বলা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই আমরা এদেশ ছেড়ে যাব।

কোথায় যাবে?

ঠিক হয়েছে সাংহাই হয়ে কানাডা যাব এবং সেখানে বসবাস করব।

উত্তম কথা খুকী, তোমরা সাংহাই হয়ে কানাডায় যাও সেটা আমিও পছন্দ করি। সেখানে ইহুদী-বিদ্বেষ তত নাই।

খুকী বললে, "যাতে আমাদের 'ফরাসী-ইহুদী' না লেখা হয় বাবা তারই জন্যে চেষ্টা করছেন। যদি আমাদের জাতের নাম 'ফরাসী' হয়, তবেই আমরা বেঁচে যাব। আমার মা এবং বাবা উভয়েই রোমান্ কেথলিক, আমাদের ভাষা ফরাসী, তবুও আমরা কি ক'রে ইহুদী হ'লাম সেটা ভেবেই পাচ্ছি না। আমরা মন্ট্রিয়েলের দিকে যাব, সেখানে সকলেই নাকি ফরাসী।

কানাডায় তোমরা যাবে সেজন্যই কি ইংলিশ শিখছ?

না, তেমন উদ্দেশ্য নাই, যদি সেখানে না যাওয়া হয় তবে অন্যত্র যেতে হবে, হিটলার ত সর্বপ্রথমেই আমাদের হত্যা করবেন সে কথা কি আমরা বুঝি না। বোধ হয় এই মাসের শেষের দিকেই আমাদের বাড়ি বিক্রী হয়ে যাবে। আমরা শুধু বাড়ি বিক্রীর অপেক্ষায় আছি।

খুকীর কথায় প্রাণে বেশ আঘাত লেগেছিল। উপদেশ দেবার মত ভাষা ছিল না, সাহায্য করারও কোন উপায় ছিল না। শুধু ভাবছিলাম, 'এটাই কি সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দেশ? আমাদের দেশে যে কোনও মুহূর্তে এক জন হিন্দু, মুসলমান হতে পারে, আবার পরের দিন ইচ্ছা করলেই মুসলিম ধর্ম পরিত্যাগ ক'রে হিন্দু হবার অধিকার রাখে, যে কোন প্রদেশে বাস করার পর সেই দেশের জাতিতে পরিণত হতে পারে, যদিও তেমন ইচ্ছা কেউ করে না কিন্তু ফরাসী দেশে সে অধিকার কারো নাই।—অন্তত ইহুদীদের যে নাই স্বচক্ষে দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম।

পরদিন সকালেই পথে বেরিয়েছিলাম। তাড়াতাড়ি করে প্যারীতে পৌছানো চাই। সে দিনই চেম্‌ব্রাই যাব ঠিক করেছিলাম কিন্তু পথ তেমন ভাল ছিল না। পিচ দেওয়া পথের মধ্যেও ছোট ছোট 'খাল বিল' হয়ে রয়েছিল। দুদিকে পথের বাড়ি ঘর দেখতে তেমন মনোরম ছিল না। সবত্রই জনহীনতা মনে হচ্ছিল। পথে যাদের সংগেই দেখা হচ্ছিল তারাই যেন আধমরা, নেহাৎ চলতে হচ্ছে সেজন্যই যেন চলছিল। পথচারীদের দেখলেই মনে হত যেন বেকার, অথবা আমাদের দেশে চৈত্রমাসে প্রখর রৌদ্রে পথিক বিরক্তির সংগে যেমন করে পথ চলে, ঠিক তেমনি বিরক্তি ভাবে সকলেরই পথ চলছিল অথবা রেঁস্তোরায় বসে রয়েছিল।

বিকালের দিকে একটি মাঠে কতকগুলি গরুকে ঘাস খেতে দেখে একটু দাঁড়ালাম। পাশেই একজন লোক গরুর দুধ দুইছিল। আমাকে

সেখানে দাঁড়াতে দেখে কোথা থেকে কতকগুলো লোক এল এবং প্রথমত ফরাসী ভাষায় কি বলল। তাদের বলছিলাম, "ফরাসী ভাষা আমার জানা নেই, ইংলিশ বলতে পারি।"

"হাঁ বুঝতে পেরেছি, মশায় হচ্ছেন বৃটিশ প্রজা। আমি কানাডায় যাব ঠিক ক'রে ইংলিশ শিখেছিলাম কিন্তু সাত রাজার ধন জাহাজ-ভাড়া কোনমতেই যোগাড় হয় নি। মহাশয়ের দেশ কোথায়?"

—ইণ্ডিয়া।

—কি করে এখানে এলেন?

—এই সাইকেলে ক'রে।

—মিথ্যা কথা, ইণ্ডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, এসব হল পাশাপাশি দ্বীপ। জাহাজ ছাড়া কি করে আসা যায়

লোকটা নিরেট মূর্খ, তার সংগে তর্ক করা চলে না, সেজন্য বলছিলাম "আপনার কথাই ঠিক. জাহাজ ক'রে হলেণ্ডে এসে সেখান থেকে সাইকেল ক'রে এখানে এসেছি। আচ্ছা বলুন এখানে থাকবার জায়গা কোথাও হবে?

আচ্ছা দাঁড়ান ঐ যে দেখছেন ভদ্রলোক দুধ দুয়াচ্ছেন তিনি হলেন এখানকার মেনেজার অর্থাৎ আমাদের সর্দার। পরিবার নিয়ে থাকেন এবং দুই একজন লোককে থাকবার মত স্থানও দিতে পারেন। এখান থেকে কোথায় যাবেন বন্ধু?

—এখান থেকে প্যারী যাব।

—অনেকদূর গাড়ী দু জায়গায় বদলাতে হয়। আপনার কষ্ট হবে না, আর কয়েক কিলোমিটর—গেলেই রেল লাইনের পাশ দিয়ে পথ পাবেন। আচ্ছা চলুন দেখা যাক্ উনি জায়গা দেবেন কি না?

গৃহকর্তা এক কথায়ই আমাকে খাদ্য এবং বিছানা দিতে রাজি

হলেন কিন্তু গৃহের আসল মালিক গৃহিণী। গৃহিণীর আদেশ ছাড়া গৃহে প্রবেশ করা যায় না। এঁরা ভেবেছিলেন আমি বিনা পয়সায় থাকতে চাই সেইজন্য গৃহকর্তা কয়েকবারই ঘরে গিয়েও ঘর হতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। অবশেষে আন্দাজে বুঝতে পারলাম, বিনা পয়সায় গৃহিণী ঘরে স্থান দেবেন না। তাড়াতাড়ি ক'রে পাঁচ ফ্রাঙ্কের একখানা নোট বের ক'রে গৃহকর্তার হাতে দিলাম। নোটখানা তাঁর স্ত্রীর হাতে দেওয়া মাত্র সহাস্য বদনে মা লক্ষ্মী ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং করমর্দন ক'রে একটি রুম দেখিয়ে বললেন "এখানে থাকবেন"। তারপর বাথ্রুম দেখালেন। এটাই হল পেইং গেষ্টকে সম্বর্দ্ধনা করার নিয়ম। যিনি দুভাষীর কাজ করেছিলেন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আর কত দিলে এঁরা সন্তুষ্ট হবেন? দুভাষী বললেন "আরও দু ফ্রাংক দিয়ে দিন তবেই হবে, এমন কি বেশি দেওয়া হয়ে গেল বলতে হবে।"

একটু বসার পরই যখন গৃহিণী এক পেয়ালা কাফি, ঘন দুধ এবং রুটি হাজির করলেন তখন মনে হ'ল আমার পয়সার সার্থক হয়েছে। যে কোনও রেঁস্তোরাতে এই ঘন দুধ টুকুর দামই পঞ্চাশ সেন্তিম*। রুটি ও আজকেরই এবং সংগে প্রচুর মাখন ছিল। বিছানা ছিল পরিষ্কার। লোকের কোলাহল মোটেই ছিল না। চিন্তা করে দেখলাম এমন সুন্দর গোলাবাড়িতে দু দিন থাকলে শরীর বেশ শক্তিশালী হবে। গৃহিণীর হাতে আরও দশ ফ্রাংক দিয়ে বললাম 'কাল পরশু দুদিন এখানে বিশ্রাম ক'রে প্যারী রওনা হতে চাই, এতে কোনও আপত্তি আছে কি?"

এই পরিবারের লোক পনেরো ফ্রাঙ্ক বোধ হয় কখনও একত্রে দেখে নি। তাই এদের কত আনন্দ। সেই সংগে দুভাষী লোকটিও আমার একই রুমে থাকবে, তারও ব্যবস্থা হল।

---

*একশত সেন্তিমে এক ফ্রাঙ্ক হয়।

গোলাবাড়ির চারদিকে কাঠের খুঁটি পুতে বেড়া দেওয়া হয়েছিল। খুটির সংগে কাঁটা-তার জড়ানো ছিল। কোন মতেই গরু পালাতে পারত না। পেছনের দিকে পাহাড়ে যায়গায় অনেকগুলি ফার-গাছ ছিল। পাশেই আপেল, তুত্ এবং অন্যান্য রকমের ফলের বাগান। বাগানের ফল শেষ হয়েছিল, তবু দু'একটা যে ছিল না বলা চলে না। শীতের বাতাস বইতে আরম্ভ করেছিল। ফল গাছের পাতা-গুলি ঝ'রে পড়েছিল। ফল-বাগানের পেছনের দিকে আর একটা ছোট ঘর, সেই ঘরটাতেই দুভাষী থাকতেন। আমার সুবিধার জন্যে মেনেজারের ঘরে এসেছিলেন। তিনিও একজন মজুর। মালিকের আদেশে ছোট ঘরটাতে থাকবার অধিকার পেয়েছিলেন। ইনি সপ্তাহের শেষে মাইনে পেতেন। এঁদের কাজ ছিল গাই দুইয়ে বিকালের দিকে দুধভর্তি ড্রাম ট্রাকে তুলে দেওয়া। দুধ সোজা প্যারীতে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ত। তাজ্জব হতে হয়েছিল কি করে এত দূরে নিয়ে যেয়ে দুধ বিক্রি করা হয়, অথচ বর্দ্ধমান থেকে কলিকাতায় কাঁচা মালও পাঠানো সম্ভব হয় না। আমাদের দেশের এইটেই বিশেষত্ব।

এঁদের মাইনে খুব কম কিন্তু পেট ভ'রে দুধ, মাখান, খেতেন এই যা ছিল সান্ত্বনা। দুভাষী তাঁর ঘর দেখিয়ে বলছিলেন, "দেখুন ত কেমন সুন্দর ঘর?" বাস্তবিক ফ্রান্সের মজুরই এমন সুন্দর ঘর ও বিছানা আশা করতে পারে, আমাদের দেশের মজুর এমন বিছানা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারে না, কখন যে এরূপ বিছানায় শুতে পারবে বলা বড়ই শক্ত।

ঘরটার অবস্থিতি মোটেই পছন্দ হয় নি। পাশ দিয়ে একটি পার্বত্য ছোট্ট জলধারা কল কল্ ক'রে বয়ে যাচ্ছিল। ক্রমাগত ঠাণ্ডা বাতাস সেদিক থেকে আসছিল। যদিও উত্তম লেপ এবং জাজিমের বন্দোবস্ত ছিল, তবুও এরকম ঘরে বাস করা শীতের দেশে আরামের নয়। ঘর দেখেই ফিরে এসেছিলাম।

পায়ের-পাতা-পচা রোগ ইউরোপ আমেরিকায় এবং শীত প্রধান দেশের সর্বত্র দেখা যায়। আমাকেও সেই পা-পচা রোগ ধরেছিল। এর কোন বিহিত না করতে পেরে খালি পায়ে শিশির-বিন্দু লাগা ঘাসের ওপর পায়চারী করেছি অনেক দিন। কিন্তু এসব হাঁটাহাটি এবং এবং অন্যান্য ওষুধ ব্যবহার ক'রেও এই রোগ থেকে রক্ষা পাই নি। ইউরোপ থেকে ভ্রমন ক'রে দেশে ফিরে অনেক ডাক্তারের শরনাপন্ন হই, কিছুতেই কিছু হয় নি। অবশেষে নিজেই বুদ্ধি খাটিয়ে এই রোগের ঔষধ আবিষ্কার করেছিলাম। যে কোন প্রকারের জলের সংগে পটাস্ পারমাংগানেট্ মিশিয়ে পায়ের পাতা দুটোকে সেই জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রেখে তারপর ভাল ক'রে মুছে শয্যা গ্রহণ করা। শোবার আগে তিন চারদিন এরকম করার পর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ ক'রেছিলাম। এই রোগের ঔষধ সানফ্রানসিস্কো থাকার সময় আবিষ্কার করি। তখন আমার ভ্রমণ শেষ হয়েছিল। পায়ের-পাতা-পচা দুর্গন্ধ রোগ নয় বৎসর আমাকে কষ্ট দিয়েছিল।

খালি পায়ে হাটছি দেখে গৃহকর্ত্তা অবাক হলেন এবং দুভাষীর সাহায্যে জিজ্ঞাসা করেন, এরকম হাঁটার কারণ কি? যখন শুনলেন যে পায়ের-পাতা-পচা রোগ এতে সারবার সম্ভাবনা রয়েছে তখন তিনিও আমার সংগে মাঠে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। এতে তার উপকার হয়েছিল কি না জানি না। আমার কিন্তু কোন উপকার হয় নি। মানুষ রোগ থেকে মুক্ত থাকতে চায়, রোগমুক্ত থাকার জন্যে নানা প্রকারের উপায় অবলম্বন করে। কোনটা সফল হয়, আবার কোনটা একেবারে অকেজো, তা ব'লে নিষ্কর্মা হ'য়ে বসে থাকা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়।

পার্বত্য পথে

[২]

গোলাবাড়ির জীবন ছিল অতি সুখের, তবে সর্বত্র সুখ পাওয়া যায় না, দুঃখও পেতে হয়। আমাদের দেশে যাকে 'গ্রাম' বলা হয়, ইউরোপের গোলাবাড়িও তার চেয়ে ভাল অবস্থায় রাখা হয়। তর্কের ছলে অনেকে হয়ত বলবেন, আবহাওয়ার জন্যেই এরকম হয়। আমাদের দেশের মত আবহাওয় এবং অবিকল সুযোগ সুবিধা পৃথিবীর অনেক দেশে আছে, কিন্তু কোথাও আমাদের দেশের মত গোলাবাড়িযুক্ত গ্রাম দেখতে পাওয়া যায় না। এর একমাত্র কারণ হ'ল আর্থিক দুরবস্থা আর সাংস্কৃতিক রুচির অভাব। আর্থিক বিষয়টির চর্চা না ক'রে সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে এখানে চর্চা করাই ভাল। এই ধরুন উনুন। আমাদের দেশের সহরে কয়লা ব্যবহার হয়, গ্রামাঞ্চলে কচিৎ কয়লা দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের গ্রামাঞ্চলেও সর্বত্র কয়লা পাওয়া যায় না, সেসব জায়গায় রান্নার জন্যে সাধারণত কাঠ পোড়াতে হয়। আমাদের উনুন্ মাটির সংগে কথা বলে। ইউরোপে কোনও উনুন আড়াই ফুট উচুঁর কম দেখা যায় না। সে দেশে রান্নাঘরে মস্ত বড় একটা টেবিল থাকে, তার চারপাশে থাকে চেয়ার। অনেকে রান্নাঘরে বই পড়তে ভালবাসে। আমাদের দেশে রান্নাঘরে কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। যাদের উনুন মাটির লেভেলে থাকে তাদের ঘরে যদি ধুলো উড়ে, তবে সেই ধুলো হাঁড়ি কড়াই-এ পড়ে। ইউরোপীয়ানদের উনুন্ উচু লেভেলে থাকায় হাঁড়ি কড়াইয়ে ধুলোবালি পড়তে পারে না—আমরা বাঙ্গালী,

সব সময়ে ভাতের চিন্তা করি। পশ্চিম ইউরোপের লোকে সবসময়ে আলুর কথাই ভাবে। কিন্তু আলু যদি না পায় তবে তারা মরে না। তাদের উনুনে জল চড়ানো থাকে, তাইতে যে কোন রকমের শাকসব্জী সিদ্ধ ক'রে খায়। ইউরোপে উনুন থেকেই কেমিষ্ট্রির জন্ম হয়েছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানরা প্যারীর উত্তর দিকটা পর্য্যন্ত জয় করেছিল। বিজয়ী জার্মানরা সাধারণ লোকের অভাবের কথা শুনত না। একটি কেথলিক মঠে উনিশটি ছেলে মেয়ে নিয়ে তিন জন কেথলিক পাদ্রী থাকতেন। একদিন সকাল বেলা দেখা গেল ঘরের ভেতরে অথবা বাইরে এমন কিছু নেই যা সিদ্ধ করে খেতে পারা যায়। তিনজন পাদ্রী রান্নাঘরে একটা হাঁড়িতে জল চড়িয়ে ভাবছিলেন কি সিদ্ধ ক'রে উনিশটি ছেলে মেয়ের মুখে কিছু দেওয়া যেতে পারে। অনেকক্ষণ চিন্তার পর একজন পাদ্রী চিৎকার করে বলে উঠলেন, "আমাদের খাদ্যের অভাব অন্তত এক মাসের মধ্যেও হবে না। উৎসুক হ'য়ে অন্য দুজন জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন কি পেলেন, যা খেয়ে আমরা অন্তত এক মাস বাঁচতে পারব? আবিষ্কারক পাদ্রী বললেন, "আমাদের মাঠে প্রচুর পরিমাণে ফুলকপি বাঁধাকপি হয়েছিল। জার্মানরা, শিকড়ের উপর থেকে কেটে নিয়েছে" শিকড় ত পড়েই আছে, উপরন্তু কয়েকটা শিকড়ে পাতাও গজিয়েছে। চল আমরা শিকড় এবং কিছু পাতা উঠিয়ে আনি। একুশ জন মানুষ অমনি মাঠে গেলেন এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপযুক্ত কপির শিকড় এবং পাতা উঠিয়ে আনলেন। জল টগবগ ক'রে ফুটছিল। পাতাগুলি ভাল ক'রে ধুয়ে গরম জলে ফেলে দেওয়া হ'ল। পাতাগুলি সিদ্ধ হবার পর সিদ্ধ পাতাগুলিকে ঘুটে তাই দিয়ে করা হয়েছিল "সুপ"। শিকড়গুলি সিদ্ধ ক'রে তার ভিতর থেকে কোমল অংশ বের ক'রে তাই দিয়ে করা

হয়েছিল পেষ্ট। উৎকৃষ্ট ও উপাদেয় খাদ্য খেয়ে একুশজন লোক স্ব স্ব চিন্তা অনুযায়ী বিগ্রহরের খাদ্য যোগাড় করতে পেরেছিল। কত বৎসর ধরে যুদ্ধ চলেছিল সেই মঠের কেউ না খেয়ে মরে নি। এইখানেই ইউরোপীয়ানদের বুদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়, অথচ আমাদের দেশে বুদ্ধি এবং সংস্কৃতির অভাবে বৎসরে লক্ষ লক্ষ লোক না খেয়ে মরে। ইউরোপে যাদেরই বাড়ীতে নিজস্ব বাগান থাকে, তারা কখনও খাদ্যের অভাবে মরে না। ভারতীয় সংস্কৃতির যারা প্রশংসা করেন তাদের সংগে আমি এক মত নই।

বি. এস্. সি. পাস করা লোকেও গ্রহণের সময় গঙ্গার স্নান করতে দেখা যায়। গঙ্গায় কর্দমাক্ত জলে নাকি পোকা হয় না, এসব লোক বেড়ান। বৈজ্ঞানিক হ'য়ে কুসংস্কার পরিত্যাগ না করাই হল এর একমাত্র কারণ। কুসংস্কার কোথা হতে এল এখানে বিচার্য্য বিষয় নয়, তবে বলতে বাধ্য আমাদের সংস্কৃতির কোনো গুরুত্ব নেই।

দু দিন পরে গোলাবাড়ি ছেড়ে আবার পথে বের হয়েছিলাম। দিনটা ছিল বড়ই খারাপ। সকাল বেলা আকাশ মেঘে অপরিষ্কার ছিল। তারপর দক্ষিণ দিক থেকে দমকা হওয়া সাইকেলের গতি কমিয়ে দিচ্ছিল। ঝাঁড়িপথ ধ'রে চলছিলাম। দুদিকে নানা রকমের বড় বড় গাছের সারি দমকা হাওয়ার সঙ্গে লড়াই করছিল। চলতে কষ্ট হচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে অনেকগুলি গ্রাম ও গোলাবাড়ি পেরিয়ে গেলাম। সন্ধ্যার আগে বোহীন (BOHIN) গ্রামে পৌছে ইচ্ছা হল, 'এই গ্রামটাতে আজ থাকলে মন্দ কি?' আটত্রিশ কিলোমিটারের মত পথ চ'লে এসেছি। প্রাকৃতিক দৃশ্য ত চিরকাল থাকবে, কিন্তু যে ফরাসী জাতিকে আজ ফরাসী দেশে দেখছি, ভবিষ্যতে এই জাত হয়ত মুছেও যেতে পারে।

ইউরোপের গ্রামের তুলনা দিতে হ'লে ইউরোপীয়ান্ অধ্যুষিত দে

কোন গ্রামের সংগে তুলনা দেওয়া চলে। বিশেষ করে ফ্রান্স একটি সাম্রাজ্যবাদী দেশ। পশ্চিম ইউরোপের সকল দেশই সম্রাজ্যবাদী। বিদেশের রক্ত শোষণ করে নিজের দেশের উন্নতি করেছিল। গ্রামের ও উন্নতি হয়েছিল। তবুও ফ্রান্সের গ্রামগুলি তেমন উন্নত ছিল না। এমন কি ইংলণ্ডের গ্রামের অবস্থা ফ্রান্সের গ্রামগুলির চেয়েও উন্নত এবং পরিষ্কার। তবুও সৌখীন ভাবে বাস করতে হ'লে, থাকতে হয় ফরাসী গ্রামে। যারা প্যারীর নাম নিয়ে বিলাসের কথা চিন্তা করেন, তাঁরা মহাভ্রান্ত। তাঁরা গ্রামেই যান এবং বলে থাকেন প্যারীতে ছিলেন। গ্রামগুলি ব্লক করে সাজানো। ফুট পাথের পরেই ছোট্ট বাগিচা। বাগিচায় অনেক রংএর সুন্দর এবং গন্ধহীন চমৎকার ফুল দেখতে পাওয়া যায়। তারপর বাড়ি। বাড়ির মাঝে হোটেল এবং ক্লাব। কোথাও হোটেল এবং ক্লাব এক সংগে আছে। এই রকমের একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। এখানে আমাকে বেশ সুন্দর একটি রুম দেওয়া হয়েছিল। রুমের সুন্দর বিছানা দেখেই মনে হচ্ছিল "এই রুমটাতে সারাজীবন কাটিয়ে দিই।" মাত্র দশ ফ্রাংক ক'রে প্রত্যেক রাত্রির জন্যে সজ্জিত রুমের ভাড়া দিতে হয়েছিল।

রুম ভাড়া করেছিলাম একটি মহিলার সংগে কথা ব'লে। এদিকে ইংলিশ ভাষার কথা বলতে পারে তেমন লোকের বড়ই অভাব। খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। ঘামে ভিতরের সার্ট ভিজে গিয়েছিল। এইরকম অবস্থায় শরীরের উত্তাপে কামিজ শুকালে গায়ে উকুন হয়। সেজন্যে সার্ট বদলাতে হয়েছিল। সার্ট থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে বুঝতে পেরে মহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, "দ্বিতীয় সার্ট আছে কি? মহিলাকে সার্ট বদলাবো ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি বললেন,'সার্ট খুলে আলাদা জায়গায় একপাশে রেখে দেবেন। হোটেলওয়ালাকে ব'লে আজই ধুইয়ে রাখব।' হোটেলওয়ালা এসেছিল

এবং ভূর্গন্ধযুক্ত কামিজটাকে নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটুও ঘৃণা প্রকাশ করে নি।

এসব হয়ে যাবার ভাবছিলাম ইউরোপে এই একটিমাত্র দেশ আছে যে দেশে মানুষের শরীরের বর্ণের উপর একটুও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। স্পেন্, পর্তুগাল, গ্রেটবৃটেন, হলেণ্ড, বেলজিয়ম, জার্মানী, ইটালী, সুইজারলেণ্ডে সর্বত্র মানুষের রংএর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। ফ্রান্সে সে রকম কিছুই নাই, কেন নাই নিশ্চয় বিবেচ্য বিষয়। ইংলণ্ডের ডেমোক্রেসীর শত প্রশংসা করা হোক সেখানেও কালার-বার রয়েছে। হলেণ্ড কালার-বারের জন্মস্থান। হলেণ্ড দেশটি ছোট্ট হ'লেও দুষ্ট লোকের অভাব নাই।

ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ জঘন্য, কন্‌স্পিরেসী করা ফরাসীদের যেন জন্মগত অভ্যাস। ঠগবাজ, জালিয়াত, ফাঁকিবাজ লোক ফরাসী দেশে যত দেখা যায়, অন্য কোন দেশে তত দেখছি ব'লে মনে হয় না, তবুও এই দেশের লোককে তাদের ভদ্রব্যবহারের জন্যে প্রশংসা করতে হয়।

একটু আগে যে হোটেলের কথা বলা হয়েছে, সেই হোটেলের মালিক আমার শরীরের রং-এর প্রতি কোনো রকম আপত্তিকর গুরুত্ব দেয় নি। হোটেলে এসেছেন থাকুন; আপনি কোন্ জাত? আপনার শরীরের বর্ণ কালো কেন? এসব প্রশ্নই উঠে না, শুধু প্রশ্ন উঠে, 'হোটেলে থাকার অর্থ আছে কি না? ইংলেণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের টাকার কথা মুখ্য নয়, মুখ্য শরীরের চামড়ার রং? গায়ের চামড়া সাদা না হ'লে টাকা থাকলেও ইংলণ্ডের অনেক হোটেলে স্থান দেওয়া হয় না।

মাত্র দু মাস আগে একটি সিংহলী পর্য্যটক আমার ঘরে এসেছিল এবং সে ইংলণ্ডে যাবে সেজন্যে ইংলেণ্ডের খুবই প্রশংসা করেছিল। তাকে প্রকাশ্যেই বলেছিলাম, "যে দেশের এত প্রশংসা করছ, একবার সে

দেশে যাও বুঝবে তুমি কোন্ শ্রেণীর জীব। তুমি একটি কালো প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নও, সে দেশের লোকের চক্ষে।" লোকটা ভয়ানক ইংলিশ ভক্ত। আমর কথা একটুও বিশ্বাস করে নি।

আজ যেখানে ১১২ নম্বর গাওয়ার ষ্ট্রীটের বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, তার ঠিক বিপরীত ফুটপাটে একটি হোটেল ছিল। এই হোটেলে অনেক বার থাকবার জন্যে চেষ্টা ক'রেও কৃতকার্য হই নি। ১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসের কথা বলছি, ওয়াই-এম্-সি-এর বাড়িতে প্রবেশ ক'রেই দেখতে পেয়েছিলাম একজন সিংহলী পাদ্রী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ও মালপত্র হোটেলে চলে গিয়েছিল, তিনি যাবেন একটু পরেই সামনের হোটেলে। কৌতুহল হ'ল—অনেকবার এই হোটেলে থাকতে চেষ্টা করেছি কিন্তু সফল হই নি অথচ এই কালো পাদ্রীর এখানে কি ক'রে স্থান পেল? এখানে পাদ্রী অথবা ধর্মের কথা মোটেই উঠে না, দেখা যাক্ পাদ্রী স্থান পান কি না? একটু পরেই সেই পাদ্রী হোটেলে গেলেন।

পাদ্রীকে দেখা মাত্র হোটেলের মেনেজার বললে, "এখানে একটি রুমও খালি নেই।"

মেনেজারকে পাদ্রী বল্লেন "রেভারেণ্ড নিকল্সনের জন্য এখানে কোন্ও রুম ঠিক করা হয়েছে?"

হোটেলের মেনেজার এবার একটু চিন্তিত হয়ে পাদ্রীকে জবাব দিলে, "তা নিয়ে আপনার মাথা ঘামাতে হবে না।"

পাদ্রী তখন বললেন, "আমিই রেভারেণ্ড নিকলসন্।"

এবার মেনেজার নিজের স্বরূপ ধারণ করলে এবং বলল, "কি ক'রে তুমি ইংরাজী ভাষা আয়ত্ত করলে? কি ক'রে তুমি ইংলিশ নাম গ্রহণ করলে? যদি তুমিই রেভারেণ্ড নিকলসন্ হও, তবে তোমার মালপত্র নিয়ে বেরো, এখানে কালো-চামড়াওয়ালাদের স্থান নেই।"

এই পৃথিবীতে আত্মসম্মান জ্ঞান আছে এমন লোকের সংখ্যা খুব কম। নিকলসন্ ছিলেন আত্মসম্মানী, কাজেই তিনি নিজের নাম বদলে মুখা আইয়া' রেখেছিলেন।

এই ত হল ইংলণ্ডে কালো-চামড়াওয়ালাদের অবস্থা। প্যারীতে কিন্তু আলাদা, একদিন একটি নিগ্রোকে মাতাল অবস্থায় দেখেছিলাম। তার পেণ্টের বোতাম আঁটা ছিল না। কোথা হতে একজন ফরাসী এসেই সেই নিগ্রোর পেণ্টের বোতাম এঁটে দিয়ে নিগ্রোকেই মারসি মঁসিয়ে ব'লে চলে গিয়েছিল। মাতালের পেণ্টের বোতাম এঁটে দিয়ে সে মাতালকেই ধন্যবাদ দিতেছিল! এক্ষেত্রে আমরা হলে কি করতাম? ইংলিশ হলে কি করত? সে জ্যনই ফরাসীদের শত দোষ থাকা সত্ত্বেও তাদের এই একটিমাত্র গুণের জন্যে সব সময় ফরাসী জাতিকে অন্তত আমি শ্রদ্ধা করি।

কেন ফরাসীরা কালো-চামড়াওয়ালাদের সমান অধিকার দিয়েছিল সেই কারণ আমি জানি, কিন্তু সেই কারণে ব্রিটিশজাতি কিন্তু ভারত-বাসীদের এমন কি গ্রীকদেরও সমান অধিকার দেয় নি।

পূর্বে'র বিষয়ে পুনরায় ফিরে যাওয়া চাই। ইতিমধ্যে অনেক নিকৃষ্ট ফরাসী হোটেলের সংগে পরিচয় হয়েছিল। গ্রামের নিকৃষ্ট শ্রেণীর হোটেলে খাব এবং থাকতে হবে এর কোনও মানে হয় না সেজন্য উত্তম হোটেলেও থাকতাম।

আমি যে হোটেলে ছিলাম সেটা নিকৃষ্ট ছিল না। সেটা ছিল উৎকৃষ্ট, সেজন্য রেঁস্তোরা ছিল না। বাইরে খেতে গিয়েছিলাম। বাইরে রেঁস্তোরা ছিল একটু নিকৃষ্ট রকমের। কম পয়সায় পেট ভ'রে খাওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। আমি ত রাজপুত্র অথবা সরকারী খয়ের খাঁ ছিলাম না, সেজন্যে ভিক্ষালব্ধ প্রত্যেকটি ফ্রাংককে হিসাব ক'রে খরচ করতে

হয়েছিল। বিদেশে গিয়ে যারাই অযথা টাকা খরচ করে, তাদের প্রতি কোন সময়ে কেউ শ্রদ্ধা দেখাতে পারে না। অশ্রদ্ধার নানা কারণ থাকে। এম্‌বেসেডার এট্‌ লার্জ এই পদবী নিয়ে যাঁরাই ভিন্ন দেশে যান তাঁদের খরচ খুব বেশী। সাধারণ লোকও এই শ্রেণীর লোককে ঘৃণা করে। আমাদের দেশের লোক এখনও সেই শ্রেণীর লোককে চিনতে পারে না। এই প্রকারের লোককে উদার ব'লেই গণ্য করা হয়। আমাদের দেশে আরও একটু রাজনৈতিক জ্ঞান পরিস্ফুট হোক্, তখন লোকে বুঝতে পারবে কে কোন্ শ্রেণীর লোক ? তখন বাজে লোকের কাছেও পলিটি-কেল্ পর্য্যটকেরা স্থান পাবে না।

রেঁস্তোরা হতে ফিরে এসে দেখলাম হোটেল বার্-এ লোকে লোকারণ্য। সেখানে কেউ হুইস্কি, কেউ ব্রাণ্ডি, কেউ ভিনো পেট ভরে খাচ্ছে। এই তিনটি পানীয়কে স্পর্শ করতাম না। শরীরের রক্ত শুষে ফেলবে, এই ভয়েই এসব থেকে দূরে থাকতাম। শরীরের রক্ত রোজই জল হ'ত, তার উপর যদি মদ খেতাম তবে পথ চলাই কষ্টকর হ'ত। পর্য্যটকের পক্ষে আহার-বিহারে সংযম একান্ত দরকার। পর্য্যটন আরম্ভ ক'রে যিনি মতিভ্রষ্ট হন তিনি মাঝদরিয়ায় নৌকো ডুবিয়ে ঘরে ফিরে আসতে বাধ্য হন এবং মিথ্যার বেসাতী করতে প্রবৃত্ত হন। সুখের বিষয়, এই শ্রেণীর পর্য্যটকের নাম অথবা তাঁদের পুস্তকের কোন সময়েই গুরুত্ব হয় না।

মাতালের মন উদার একথা সব সময়ে সত্য নয়, বিশের ধনীদের দ্বারা পরিচালিত এই হোটেলে যারা মদ খাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সবাই ছিল ধনী। এদের প্রত্যেককে একটি করে ভিক্ষা-পত্র দিয়েছিলাম। অনেকেই সন্দেহ পূর্ণ ভাষায় আমাকে নানা রকম প্রশ্ন করতেছিল। শেষে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "এত দেশ যে ভ্রমণ করেছেন তার প্রমাণ কি ?" প্রেস-কাটিংগুলো

এবং অটোগ্রাফ-বই সংগেই ছিল। বই দুটো সমনে ফেলে দিয়ে এক দিকে দাঁড়িয়ে এক ড্রাম ব্রাণ্ডি দিতে বলাতে বারমেন্ অবাক হয়েছিল। ষাট ফোঁটা ব্রাণ্ডিতে নেশাও হয় না, মুখেও লাগে না। বারমেন্ আমার আদেশ অবহেলা করলে না এক গ্লাস জলের সংগে ষাট ফোঁটা ব্রাণ্ডি খাওয়া দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিল। এতে কিন্তু বেশ উপকার হয়েছিল। যে লোকটি আটোগ্রাফ-বই এবং প্রেস-কাটিং দেখেছিল সে আমার ভ্রমণের সঠিব প্রমাণ বুঝতে পেরে, অন্যান্য সকলেব কাছ থেকে একশত ফ্রাংক চাঁদা উঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল।

জার্মাণ টুরিষ্টরা ইউরোপের সর্বত্র চলাফেরা আরম্ভ করেছিল। ভিক্ষা ক'রে তারা নিজেদের খরচ চালাত। রাত্রে তারা থাকত হোটেলে, খেত রেঁস্তোরায়। ব্রিটিশ টুরিষ্টও এখানে কম ছিল না। তারাও জার্মাণ টুরিষ্টদের মত ভিক্ষা করেই খরচ চালাত। দুঃখের বিষয়, ফরাসী টুরিষ্ট মোটেই দেখা যেত না। জার্মাণ টুরিষ্টরা পর্য্যটন করত শরীরের সহনশীলতা বাড়াবার জন্য। ব্রিটিশ টুরিষ্টরা কন্‌টিনেণ্ট্ ভ্রমণ করত জ্ঞান-অর্জনের জন্য। ফরাসী টুরিষ্ট যে দু-একজন দেখা যেতন তা নয়, তবে তারা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং তাদের গতি ছিল ক্রমেই দূর দুরান্তরে এবং সেজন্যেই ফরাসী জাতের মধ্যে যে সব পর্য্যটক দেখেছিলাম তাদের সংগে দেখাহয়েছিল বিদেশে!

একশত ফ্রাংক পকেটেস্থ করার পর বারে বসে থাকতে ইচ্ছা হয়নি, নিজের রুমে যাওয়া ভাল হবে মনে করছিলাম। পূর্বেই বলেছি এটা গ্রাম। সাধারণত গ্রামে ধনী এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের সংখ্যা শতকরা নিরানব্বই জন, সেজন্যে এখানে দুর্নীতি বেশী। এক-তরফা ধনদৌলতের সংগে ব্যভিচারের সম্বন্ধ অঙ্গাঙ্গী। ধনী লোকের লালসা অতীব প্রবল। কিবা রাত কিবা দিন এরা যে কি করে, যদি বুঝতে হয় তবে সামান্য কথায়

বলছি, ফেকাশে মুখ, কুটিল হাসি এই প্রকারের নিদর্শনের কথা বলা যেতে পারে, এর বেশি নয় কারণ এটা ভ্রমণ কাহিনী। এতে কুৎসিত কথা লেখা যায় না। সেজন্যে সুরুচিত অনুরোধে নোংরা ব্যাপারের উল্লেখ এখানে পরিত্যাগ করা হল। বর্ত্তমানে প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক দেশ বৃটিশ কথিত ফ্রান্সের পর্য্যায়ে এসেছে।

মজার বিষয় হল, বড় বড় শহরের দরিদ্রের বাস। বড় বড় সহরের আশেপাশে কলকারখানা থাকে। মজুররা মজুরী করে এবং সেথানে থাকে। এখানে বিশেষ ক'রে মনে রাখতে হবে, ভারতীয় মজুরের সংগে পশ্চিম-ইউরোপের কোন সম্পর্ক নেই। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে আর্থিক উন্নতিতে পশ্চিম-ইউরোপের মজুরের সংগে ভারতীয় যে কোন পরিবার, যাদের আয় মাসে তিনশত থেকে চারশত টাকা, তাদের সংগে তুলনা করতে পারা যায়। ১৯৩৫ সালের শেষ ভাগের ভ্রমণ-কাহিনী এখানে লেখা হয়েছে! হয়ত অনেকে বলবেন, বর্তমানের সংগে ১৯৩৫ সালের শেষ ভাগের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। খবর নিয়ে জেনেছি, ১৯৩৫ সালে ফ্রান্সে যে অবস্থা ছিল, বর্তমানেও ঠিক সেই অবস্থা। একটুও বদলায় নি। আমাদের পরিবর্তন দেখে যেন কেউ মনে না করেন ফরাসী দেশেও মাখনের সংগে ময়দা মেশানো হয়, পনীরের সংগে আটা মেশানো হয়। খাদ্যবস্তুতে অখাদ্য ভেজাল দেওয়া শুধু আমাদের 'আধ্যাত্মিকতার' দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। সারা দুনিয়ার আর কোনও জায়গায় জাতির স্বাস্থ্যনাশকারী এমন জঘন্য মনোবৃত্তি কারো নেই।

এর পরে কোনও গ্রামে না থেকে খামারে অথবা সহরে থাকাই মনস্থ করেছিলাম। পরের দিন পথ চলতে চলতে সামনে মস্তবড় একটি সহর পড়ল। তার নাম হল কোয়েন্‌তিন (Quentin)। এদিকে

আমার আসবার কারণ ছিল। কোয়েন্‌তিন্ থেকে প্যারী পর্যন্ত সর্বত্র উৎরাই। একটু চড়াই ঠেলে যদি ভাল উৎরাই পাওয়া যায় তবে ক্ষতি কি? এত বড় সহরটাতে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। খাঁটি কথা হল, সহরে থাকলে খরচ বেশি হয় আর গোলাবাড়িতে থাকলে খাওয়া ভাল ত পাওয়া যায়, উপরন্তু শান্তিতে থাকা যায়। গোলাবাড়ির লোকে কোনও রাজনৈতিক ব্যাপারের আলাপ-আলোচনা করে না। সহরে একটু যারা পড়তে পারে তারা সস্তা-দামের সাপ্তাহিক এবং মাসিক পত্রিকা পড়তেই পছন্দ করে। মজুরদের দৈনিক পত্রিকাগুলো বেশ সস্তা। বিদেশী সংবাদে ভর্তি, সেই সংগে থাকত 'মজুরসংবাদ'। আমিও 'ডেলি টেলিগ্রাফ' নামে একটা ইংলিশ দৈনিক পত্রিকা এক ফ্রাঙ্ক দিয়ে কিনলাম। আরাম ক'রে শুয়ে থাকতে হ'লে গোলাবাড়ি সবচেয়ে ভাল জায়গা। তা ছাড়া পুলিশের টানা হেঁচকা থেকে রক্ষা পাওয়া যেত। রক্ত খেকো ধূর্ত পেতনী''দের সংগে মোটেই দেখা হত না। রক্ত খেকো ধূর্ত পেতনী'' কাকে বলে এখানে বলা হল না, এসব বাজে কথা ভ্রমণকাহিনীতে স্থান না পাওয়াই ভাল।

সেদিন বিকালে পথের পাশে একটি গোলাবাড়ি দেখে সেখানই থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল। ডেলি "টেলিগ্রাম'' এবং লণ্ডন থেকে প্রকাশিত "ডেলী মিরার" কাগজ সহর থেকে কিনে নিয়েছিলাম। কোনও গোলাবাড়িতে একদিন থেকে এই দুখানা সংবাদপত্র ভাল ক'রে প'ড়ে নিয়ে প্যারী এবং লণ্ডন্ দেখার জন্য প্রস্তুত হব, এই ছিল উদ্দেশ্য।

সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। পশ্চিম আকাশে তখনও আলো ছিল। রোদ আরামপ্রদই ছিল। আকাশে সূর্য্য ছিল না। দেড় ঘণ্টা আগে অস্ত গিয়েছিল। তবুও সূর্য্যের আলো দেখতে পাচ্ছিলাম, এটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? আকাশে সূর্য্য নেই, অথচ সূর্য্যের আলো বেশ

দেখতে পাওয়া যায়, এরকম অবস্থা যদি আমাদের দেশ হয়, তবে মুসলমান বলবে "আল্লার কুদ্‌রৎ, হিন্দু বলবে "নিশ্চয়ই রসাতল", কিন্তু ইউরোপের বৈজ্ঞানিক বলবে এটা পৃথিবীর দক্ষিণায়ন'। যা আমরা জানিনা অথবা জানতে চেষ্টাও করি না তা-ই হয় 'রহস্য এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'। বিষয়টা ঠিকভাবে জানতে পারার পরে কোন রহস্যও আর 'রহস্য' থাকে না। রহস্য ততক্ষণই 'রহস্য' থাকে যতক্ষণ তার কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের যুগে রহস্যবাদ অন্ধবিশ্বাস ও যুক্তিহীনতা ক্রমেই লোপাট হয়ে যাচ্ছে।

জীবিত ও উন্নতিশীল জাতির প্রাণশক্তির লক্ষণই হল—সমস্ত ব্যাপারকেই খুঁটিনাটি ক'রে জানবার প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা। আর যে জাত ধ্বংসোন্মুখ ও জড়তাপ্রাপ্ত, সেই জাতেরই মধ্যে জ্ঞানের পিপাসা নেই। নতুন নতুন ভাবে সত্যকে জানবার আকাঙ্খা সে জাতির মধ্যে লুপ্ত হয়ে গেছে। পৃথিবীর অন্য সব জাতি কর্ম্মশক্তি ও মননশীলতার দিক দিয়ে কেবলই এগিয়ে চলছে, সে চলার শেষ নেই। অলস মুমূর্ষু জরাগ্রস্ত জাত আপনার অচলায়তনে চুপচাপ বসে থাকে। কোনও নূতন ব্যাপারকে দেখবার ও জানবার ও বুঝবার আগ্রহ তাদের মোটেই থাকে না। অজ্ঞানতার জন্যে তাদের মধ্যে বড়াই ও অহঙ্কার থাকে "আমারা সবই জানি আমাদের শেখবার বা জানবার মতন বিষয় পৃথিবীতে আর কিছুই নেই।" আমাদের দেশের লোক সেই প্রকৃতির।

এরোপ্লেন আবিষ্কার হল, অমনি আমাদের দেশের লোকে বলতে আরম্ভ করলে, আমাদের দেশেও পুষ্পক রথ ছিল, ইউরোপীয়ানরা এমন কি নূতন দেখালে। যাহাই আবিষ্কার হউক আমাদের দেশে সবই ছিল নূতন কিছুই নয়। আরবরাও বলে তাদের দেশেও সবই ছিল, যা কোরানে পাই, তা কোথাও নাই এবং হতেও পারে না।

আমি যে গোলাবাড়ির কাছে এসেছি, তার চারি দিকে হে ঘাস শুকাবার জন্য দেওয়া হয়েছিল। ঘাসের সুব্যবস্থা না করলে শীতের সময় গরুতে খাবে কি? ইউরোপেও সর্বত্র যদিও গোমাংসের প্রচলন, গরু যদিও তারা হত্যা করে তবুও যে কয়টি গরু তারা বাচিয়ে রাখে সেই গরু যে যত্ন পায় আমাদের দেশের হস্‌পিটালের রোগীও তত যত্ন পায় না। গোলা বাড়ির সামনেতে কাউকে দেখতে পেলাম না কিন্তু চমৎকার করে সজানো একটি হে ঘাসের স্তূপ দেখতে পেলাম। হে-ঘাসই গরুর আসল খাদ্য। হে-ঘাসের স্তূপটা দেখবার জন্যে ঘরটার পেছন দিকে চলে গেলাম। কাছে যাওয়া মাত্র বেশ মিষ্টি গন্ধ অনুভব হল। মনে হচ্ছিল, এক সপ্তাহ আগে হয়ত স্তূপ সাজানো হয়েছিল। কাছেই একটা গাই ঘাস খাচ্ছিল। গাইটার জাত দেখে মনে হচ্ছিল—বোধ হয় উত্তর জার্মানী থেকে গাইটা এদেশে আনা হয়েছে। দূরে আরও অনেকগুলি গরু ঘাস খাচ্ছিল। তখন মাঠে ঘাসের অভাব ছিল। শীত প্রায় এসে পড়েছিল, সেজন্যে মাঠের তাজা ঘাস শুকিয়ে যাচ্ছিল।

বাড়িটা অনেকক্ষণ দেখার পরেও কোনও লোকের সাড়া পাচ্ছিলাম না। কাউকে না দেখতে পেয়ে ঘরে ভেতর কেউ আছে কি না দেখতে চেষ্টা করলাম। ঘরের মধ্যেও কেউ ছিল না। খানিকক্ষণ পরে ঘরের পেছন দিক থেকে একটি যুবতী বেরিয়ে এলেন। যুবতী—যুবতীই তাঁর শরীরের রং অনেকটা সাদা। 'অনেকটা সাদা' একথা বলার মানে আছে। আমরা সকল ইউরোপীয়ানকেই 'শ্বেতকায়' বলি। আসলে বিষয়টা একেবারে ভুল। ইউরোপে "ব্লু-ব্লাড" ব'লে একটি শব্দের প্রচলন আছে, 'ব্লুব্লাড' বলতে আসলে কোনও রকমের রক্ত নাই। যাদের শরীরের চামড়া দুধের মত সাদা তাদের নারি দেখা যায় এবং দেখতে নীলবর্ণ দেখায়। এসব লোককেই ইউরোপের লোকে 'শ্বেতকায়'

বলে। এই যুবতীর শিরাগুলি দেখা যাচ্ছিল না। তাঁর শরীরে প্রচুর রক্তমাংশ থাকাতে রক্তিমাক্ত দেখাচ্ছিল। গাল দুটো যেন বড় বড় দুটো আপেল। চুল সোনালী, চোখ উজ্জ্বল এবং চোখের তারা গাঢ়নীল। কোমর সরু। হাত চওড়া এবং শক্ত। দেখলেই মজুর শ্রেণীর মেয়ে বলে মনে হয়। পা শক্তিশালী অথচ পাতলা। মুখে কঠোরতা ফুটে বের হচ্ছিল।

এই প্রকারের যুবতী সাধারণত মজুর শ্রেণীর পরিচালক হয়। যুবতীকে দেখে আমার কিছুই অদ্ভুত মনে হচ্ছিল না। আমাকে দেখামাত্র যুবতী কি জিজ্ঞাসা করছিলেন তার কিছুই বুঝতে পারি নি। তিনি কোন ভাষায় কথা বলছিলেন তা অনুভব করতে সক্ষম হই নি। আমি কিন্তু আমার কথা ইংলিসেই বলতে বাধ্য হয়েছিলাম। 'থাকতে চাই আর খেতে চাই এবং সেজন্যে যা খরচ লাগবে তাও দিয়ে প্রস্তুত।' আমার কথা বোধ হয় যুবতী কিছুটা বুঝতে পেরেছিলেন তবে চিন্তা করছিলেন কেন তাঁকে চিন্তিত দেখে তাড়াতাড়ি পাঁচ ফ্রাংকের একখানা নোট বের করে দিলাম। যুবতী নোটখানা না নিয়ে বারান্দায় বসতে বললেন এবং কোথায় বসতে হবে তাও দেখিয়ে দিলেন। কতক্ষণ পরে যুবতী আমাকে এক পেয়ালা কাফি খেতে দিলেন। কাফিতে প্রচুর পরিমাণে ঘন দুধ থাকায় শরীরটাতে তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে এসেছিল।

সূর্য্য অস্ত গেল। পশ্চিমের আকাশ বেশ লাল হয়ে উঠল। উত্তরে আকাশ থেকে ক্রমেই একটি নির্মল জ্যোতি আকাশ ঢেকে ফেলছিল। কতক্ষণ পরে সোনালী সূর্য্যকিরণ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। অন্ধকারের পরিবর্তে সূর্য্যকিরণ রাত্রির আগমন জানিয়ে দিল। বেশিক্ষণ বারান্দায় বসে থাকতে ইচ্ছা হল না। একটু বেড়াতে ইচ্ছা হল। মাঠের দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম যুবতী একটা গর্ত খুড়ছেন এবং বড় বড়

মাটির চাপড়া উঠাচ্ছেন। গর্ত খোড়া হয়ে গেলে ঘুরে ফিরে এসে ঘরের পেছনের নর্দ্দমা থেকে জঞ্জাল উঠিয়ে গর্তে ঢালতে আরম্ভ করলেন। জঞ্জাল ছিল দুর্গন্ধে ভর্ত্তি। তাতে কত কিছু ময়লা ছিল কে জানে? দুর্গন্ধের জন্যে মাঠে দাঁড়াতে পারছিলাম না। অনেক বালতি জঞ্জাল নিয়ে যাবার পর যুবতী দুর্গযুক্ত হাতে ঘরে ফিরলেন। আমি পূর্বেই বারান্দায় ফিরে এসেছিলাম। যুবতী যখন ঘরে ফিরছিলেন তখন তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম বের হচ্ছিল।

যুবতী ঘরে এলেন এবং গরম জলে দেহকে পরিষ্কার করে সুগন্ধযুক্ত সাবান দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে নিলেন। এইটা হল ফরাসী সভ্যতা। ইংলিশ, স্কচ্, ডাচ্ এবং অন্যান্য ইউরোপীয় জাতের লোক শুধু সাবান দিয়েই হাতমুখ ধুয়ে নেয়, সুগন্ধযুক্ত সাবান ব্যবহার করে না।

খানিক পরে যুবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই আমাকে বললেন "তবে কি মঁসিয়ে বৃটিশের প্রজা?" হাঁ, না কিছুই বলতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, শুধু বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লেগেছিল। কোনও বিদেশী জাতের প্রজা ব'লে নিজের পরিচয় দেওয়া কত লজ্জা ও গ্লানির বিষয় সে ব্যাপারটা যারা বিদেশে যায় না তারা বুঝতে পারে না।

স্বাধীনতা পাবার পূর্বে আমাদের দোষ সকল দিক দিয়েই প্রকাশ পেত। এখন স্বাধীন হয়েছি, হয়তো দোষ শুধরাতে সক্ষম হব। যুবতী স্বাধীনতার কথা নিয়ে যেমন বিপদে ফেলেছিলেন, তেমনি সাংহাই নগরীতে একটি চীনা দোকানী আমাকে বেশ শিক্ষা দিয়েছিল। সাংহাই নগরীতে একদিন আমি এবং মিনুন্ নামে একটি লোক কোনও দোকানে মাখন কিনতে যাই। মাখনের দোকানে দুই রকমের মাখন ছিল। একটি খাঁটি অন্যটি নকল। আসল এবং নকল মাখন নিয়ে যখন আমরা তর্ক-বিতর্ক করছিলাম, তখন চীনা মাখনওলা আমাদের বলছিল,

"তোমাদের নিজস্ব কোনও ভাষা নেই বোধ হয়, সেজন্যেই ইংলিশ বলছ ?" চীনা দোকানীকে আমি জবাব দিতে সক্ষম হয়েছিলাম, কিন্তু তাতে দোকানী সুখী হতে পারে নি। সে বলছিল, "আমাদের (চীনাদের) লেখ্য ভাষা সমগ্র চীন, কোরিয়া এবং জাপানের লোকের কাছে পরিচিত। মেন্দেরিণ্ কথ্য ভাষা বর্তমানে লেখ্য ভাষার স্থান দিতে আরম্ভ করেছে, তোমাদেরও সেরকম একটি ভাষা সাধারণ ভাষা রূপে গ্রহণ করা কর্তব্য।"

মাখন কিনে ফেরবার পথে আমি এবং মিন্‌ন্ রোমান্ হিন্দুস্থানী ভারতের সাধারণ ভাষারূপে গ্রহণ করেছিলাম এবং বিদেশে কোনও ইণ্ডিয়ানের কাছে যখনই পত্র দিতাম তখনই রোমান অক্ষরে হিন্দুস্থানীতে লিখতাম কিন্তু টেণ্ডন, রাজেন্দ্রপ্রসাদ শ্রেণীর লোকের বিরোধিতায় এবং মহাত্মা গান্ধীর "to please everybody" নীতিতে আমাদের পূর্ব পরিকল্পনা বর্তমানে বাতিল হলেও ভবিষ্যতে জ্ঞানী এবং বুদ্ধিজীবিরা গ্রহণ করবেন। ভাষাসাম্রাজ্যবাদীদের পতন অনিবার্য্য। কোন মতেই ফেনাটিক্‌দের কেউ প্রশ্রয় দেবে না। মহাত্মা গান্ধি নাকি ব'লে গেছেন হিন্দী এবং উর্দু উভয় অক্ষরই শিখতে হবে। তিনি হয়ত বুঝতে পারেন নি, ভবিষ্যতের ভারতীয় জনসাধারণ তাঁর এই উপদেশটি মেনে চলবে না। দুটো অবৈজ্ঞানিক লিপি শেখবার ইচ্ছা হবে শুধু ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দেরই কারণ ওঁদের গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য শেখা একান্তই দরকার হবে।

যাই হোক, এখন ফ্রান্সে আমার প্রবাস- কাহিনীর কথাই আবার বলছি। আরও কতক্ষণ পরে যুবতী আর এক পেয়ালা কাফি দিয়ে বললেন "তবে আপনি ইংলিশ ?"

"না মাদাম,, আমি ইংলিশ নই, একজন হেঁদু, (ইণ্ডিয়ার বাসিন্দা)। অতি কষ্টে একটি মাত্র বিদেশী ভাষা শিখতে সক্ষম

হয়েছি। আপনাদেরও অনেক কলোনী আমাদের দেশে আছে, যেমন পণ্ডিচেরী, চন্দননগর ইত্যাদি। যারা আপনাদের কলোনীতে বাস করে তারা আপনাদের ভাষাই শেখে।

এবার যুবতীর একটু দুঃখ হল। অবশ্য আমার দরদে যুবতী দরদী হন নি। তিনি দুঃখিত হয়েছিলেন এই জন্যে যে আমি কেন তাদের কলোনীতে জন্মগ্রহণ করি নি। আমি যদি তাদেব প্রজা হয়ে এবং ফবাসী ভাষায় কথা ব'লে পৃথিবীভ্রমণ কবতাম, তবে সেই যুবতীর কত আনন্দ হত। এসব কথা বলতে যুবতীব একটুও বাধেনি। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। ভাবছিলাম এব বাড়ি থেকে তখনি চলে যাই। অবশেষে বলতে বাধ্য হলাম, "সাম্রাজ্যবাদীবা শীঘ্রই আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হবে। পৃথিবীতে যত কলনী আছে সবই একদিন শ্বেতাঙ্গদের কবল থেকে মুক্ত হবে।"

এবাব যুবতী একেবারে চুপ মেরে গেলেন এবং বললেন মসিযে পলিটিকো"? অর্থাৎ, 'মহাশয় কি রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারের লোক?' তাবপরই বললেন তাঁর মা বাবা এখনই ঘবে আসবেন, তাদের জন্যে রান্না করতে হবে। যুবতা ঘবের ভেতর গেলেন। দূব থেকে আলু এবং বাঁধাকফি সিদ্ধের গন্ধ পেয়েছিলাম। সেই গন্ধ কত সুমিষ্ট শুধু ক্ষুধার্ত্তই বুঝতে পাবে।

পাহাড়ের অপব দিক থেকে তিনজন লোক আসছিল, পবে আরও একজন লোক তাদের সংগে যোগ দিয়েছিল। দেখলেই মনে হয়, লোকটি ভাড়াটে মজুর। চাবজনেই আমার মুখেব দিকে তাকিয়ে ঘবেব ভেতবে চলে গিয়েছিল। গবম জল তৈরী ছিল। বেসিনে ক'রে গরম .ল এনে সকলেই ষ্টেণ্ডেব ওপর রেখে মুখ হাত ধুয়ে ল্লে। কিন্তু কেউ পা ধু'লে না। ইউরোপে স্ত্রীলোকেরা পুরুষের

সামনে পা পরিষ্কার করে না। এতে নাকি পুরুষের বড়ই ঘৃণা হয়। অতএব গৃহিণীর পা-ধোয়া সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। অথচ আমাকে হাতমুখ ধুতে জল দেবার পর হাতমুখ ধুয়ে বাকি জল দিয়ে পা ধুয়েছিলাম। এসব বিষয়ে কারো মুখের দিকে কখনও চেয়ে থাকতাম না।

এদের বিশ্রাম করবার সময়ে, যুবতী তাদের সংগে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কতক্ষণ পরে একটি লোক জিজ্ঞাসা করলে, আমার মুখ এত মসৃণ কেন? আমি কি কোনও রকমের তৈলাক্ত পদার্থ মুখে লাগাই? ভ্রমণের সময় সাবানও ব্যবহার করবার মত সুযোগ হ'ত না। লোকটিকে শুধু জানিয়ে দিলাম, তার প্রশ্নের উত্তরে শুধু না" শব্দই ব্যবহার করা চলে। এতে সকলেই অবাক হয়েছিল। তারা জানত না যে, আমার শরীরে তিনটি রক্তের সমাবেশ ছিল এবং সেজন্যেই সহজে কেউ বয়স বুঝতে পারত না।

যে লোকটি আমার সংগে কথা বলছিল তার ইংলিশ বলার কায়দা অনেকটা ইংলিশদের মত। জিজ্ঞাসা ক'রে জানতে পেরেছিলাম Man (মেন্) দ্বীপে সে অনেক বৎসর ছিল এবং সেখানেও ইংলিশ মজুরদের সংগেই কাজ করত। মেন্ দ্বীপকে সে ভারী পছন্দ করে। তার ইচ্ছা সুবিধে পেলেই সে আবার মেন্ দ্বীপে ফিরে যাবে।

নানা বিষয়ের বই পড়ার চর্চ্চা ইউরোপের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বেশ প্রবলভাবেই দেখতে পাওয়া যায়। ধনী, মানী, বিদ্বান থেকে আরম্ভ করে কলকারখানার মিস্ত্রী মজুর কারিগর কিম্বা রাস্তার ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত এবিষয়ে প্রায় সকলেরই সমান উৎসাহ। অবশ্য প্রত্যেক দেশে কতক লোক থাকে তারা শুধু টাকা-রোজগার, খাওয়া, ঘুম, আড্ডা, ইয়ারকী, হৈ চৈ ক'রে জানোয়ারের মত জীবন কাটায়। আমাদের

দেশের লোকের মধ্যে পড়াশুনার চর্চ্চা খুবই কম। যাঁরা নানা রকম বিষয়ে পড়াশুনা নিয়ে আজীবন থাকেন ভারতবর্ষের বিশাল জনসংখ্যার তুলনায় তাঁরা খুবই অল্প। 'ধর্ম্মশাস্ত্র' পড়াই আমাদের দেশে রেওয়াজ। বিজ্ঞান 'ইতিহাস' রাজনীতি, শিল্পকলার বই বাংলা দেশে খুব কম লোকই পড়েন। কতকগুলি বাজে হালকা নভেল নাটক পড়াই আমাদের বাঙ্গালী জাতের মধ্যে প্রধানত দেখা যায়। সিরিয়াস্ কোনও বিষয় পড়বার মন উৎসাহ ও ধৈর্য, আমাদের মধ্যে একেবারেই কম, হাজারে একজনও পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ইউরোপের লোক'ও বই পড়ে বটে, কিন্তু তাদের পুস্তক যেমন দুরূহ বিষয় নিয়ে রয়েছে তেমনি আছে হাল্কা বিষয় নিয়ে। হালকা বিষয় লিখবার মত বিষয় বস্তু তাদের ছিল এবং আছে, আমাদের ছিল না এবং বর্তমানেও নাই। ইউরোপের চোর, ডাকাত, গোয়েন্দা, পর্য্যটন কাহিনী, কিছুরই অভাব নাই। এই ত হালে আমরা স্বাধীন হয়েছি, এখন আমাদের দেশেরও আর কিছু না হউক এডভেন্চার-কারী হবে, যাদের কথা লিখতে পারা যাবে এবং সেই সংগে পরা যাবে এডভেন্চার এবং হালকা নভেলের সৃষ্টি করতে। লণ্ডনের পরিবর্তে কলিকাতা, স্কটলেণ্ড ইয়ার্ডের পরিবর্তে লালবাজার বসিয়ে দিয়ে হালকা নভেলের সৃষ্টি করা যায় না।

ফ্রান্সে সাধারণ লোকদের ইতিহাস পড়ার তত চাড় নেই কিন্তু ভৌগোলিক তথ্য পূর্ণ পুস্তকের বহুল প্রচার দেখা যায়।

তিনজন পুরুষই পাইপ মুখে দিয়ে যে-যার বই পড়তে আরম্ভ করেছিল। ইউরোপে বয়স্ক পুত্র পিতার সাবনে তামাকের পাইপ অথবা সিগারেট খেতে পারে এবং দরকার হলে মদের গ্লাসের মাধ্যমেও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে। ইউরোপে আরব সভ্যতার আঁচড় পড়েনি, এটাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আমাদের দেশেও সর্বত্র আরব সভ্যতার ছাপ পড়ে নি।

যেখানেই দিল্লীর সম্রাটদের প্রভাব কম পরেছিল সেখানেই পিতা পুত্রে একত্রে মাদক দ্রব্য ব্যবহায় করতে দেখতে পাওয়া যায়।

খাওয়া শেষ হবার পর মা এবং মেয়ে বাসন মাজতে লেগে গেলেন। বাসন-মাজা হয়ে গেলে বাসন মুছতে হয়। বাসন মুছা হবার পর এঁদের কেউ পুস্তকের শরণাপন্ন হলেন না। দুজনেই যে-যার বিছানায় চলে গেলেন।

আমাকেও পৃথক বিছানা দেওয়া হয়েছিল। অনেকক্ষণ খবরের কাগজ পড়বার পরে আমিও বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

নির্দ্দিষ্ট দিনে এই গোলাবাড়ি থেকে রওনা হলাম। এখান থেকে প্যারী সহর প্রায় সত্তর মাইল দূর। কাজেই পর পর দুদিন প্যারীর পথে ছিলাম। পথের মধ্যে প্রত্যেক দিনই গোলা-বাড়িতে কাটিয়ে যে দিন প্যারীতে পৌছব, সেদিন দেখা হয়েছিল আমার এক পূর্বপরিচিত বন্ধুর সঙ্গে। এই লোকটি জাতে গ্রীক। ইনি বেশ ভাল ইংলিশ বলতেন। উপহাস ক'রে প্রায়ই তিনি বলতেন, তাদের প্রজাবৃন্দকে দেখতে বের হয়েছেন। গ্রীকদের দেওয়া সভ্যতার আলোকে আলোকিত হয়েই আজ পাশ্চাত্য দেশের লোক সভ্য হয়েছে। তাঁর মতে তিনিও পূর্বদেশবাসী। তিনি যে পূর্ব দেশবাসী সে সম্বন্ধে পূর্বে অনেক কিছু বলা হয়েছে, সেজন্যে নতুন করে এখানে কিছুই বলা হল না। এই ভদ্রলোকই বারবার বলেছিলেন, প্যারীতে গিয়ে যেন 'সেলভে দু সেলুই' অর্থাৎ সালভেসন আর্মির বাড়িতে থাকি। ভদ্রলোকের উপদেশ মত সেখানেই ছিলাম এবং সেখানে বেশ শান্তিতে ও আনন্দে কাটিয়ে ছিলাম কারণ, যাঁরা অতিথি কিম্বা দর্শক হিসাবে সেখানে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন যথার্থ ভদ্র ও শিক্ষিত। তাঁদের মনও ছিল উদার। সাধারণ জগতের ছোটখাট নোংরা ব্যাপার থেকে তাঁরা একেবারেই

দূরে থাকেন। নানা বিষয়ে তাঁদের গভীর পাণ্ডিত্য থাকায় তাঁরা যে সব কথাবার্ত্তা আলাপ আলোচনা করতেন, সে সবের মধ্যে অনেক কিছুই শেখবার ও জানবার বিষয় ছিল। এইসব লোকেদের সঙ্গে থাকলে সত্যই মন উন্নতি লাভ করে। যথার্থ শিক্ষায় ও জ্ঞানে মানুষকে সত্যই ভদ্র ও উদার ও মহৎ করে। অশিক্ষায় ও কুসংস্কারে মানুষকে একেবারে পশুর মত অবনত করে দেয়। বিদ্যাহীন জ্ঞানহীন অমার্জ্জিত লোকের সংসর্গ তাই নরকের মতন যন্ত্রণাপূর্ণ ও অশান্তিময়। জ্ঞানী, বিদ্বান ও মহৎপ্রকৃতি ব্যক্তির সংসর্গই স্বর্গ।

ফরাসী দেশের সীমান্ত হতে এখান পর্য্যন্ত যতটুকু পথ অতিক্রম করতে হয়েছে সবটাই পর্বতাকীর্ণ। পর্বতগুলিও তত সুন্দর নয়। মধ্যে ইউরোপের পর্বত দেখতে বেশ সুন্দর। সুইজারলেণ্ডের পর্বত এবং আমাদের দার্জিলিংএর পর্বতমালা একই ধরণের। হঠাৎ এক ঝাকুনিতে যেন সমুদ্র গর্ভ হতে আকাশের দিকে ছুটেছিল। উত্তর ফ্রান্সের পর্বত মালাও সেরূপ, সেজন্য বসতি খুব কম। মধ্য ফ্রান্সেও পাহাড়গুলি চেপ্টা এবং নয়নাভিরাম।

মধ্য ফ্রান্সে

উত্তর ফ্রান্সের গোলাবাড়ি দেখেছিলাম বেশ পরিষ্কার, কিন্তু মধ্য ফ্রান্সের গোলাবাড়ি তত পরিষ্কার দেখতে পাই নি। 'অপরিষ্কার' বলতে অবশ্য যা বলতে চাই, তার সংগে যেন আমাদের দেশের অপরিচ্ছন্নতার সংগে কেউ তুলনা না করেন। ফ্রান্সের সংগে যখনই কোন কিছুর তুলনা করেছি সবটাই তুলনা করেছি হয় জার্ম্মানী নয় ইংলণ্ডের সংগে। আমাদের দেশের কেহ যেন মনে না করেন, ফ্রান্সের গোলাবাড়ির সংগে আমাদের ক্ষেত খামারের তুলনা করছি। ধর্মের ষাঁড় কালিকাতার মত কোন দেশের ফুটপাথে বিচরণ করে না, এমন কি গোলাবাড়িতেও নয়। রোগাক্রান্ত কুকুর বিড়াল এবং অন্যান্য পশু কলিকাতা সহরে বুকের উপর যেমন অবাধে বিচরণ করে, কোন সভ্য দেশে সে রকম বিচরণ করতে পারে না। প্রায় সবটা পৃথিবীর বড় বড় সহর গ্রাম নগর দেখে এসেছি, কোথাও সহরে গ্রামে অথবা নগরে 'খাটাল' দেখতে পাওয়া যায় না, অন্তত আমি ত দেখতে পাইনি। আবার এটাও বেশ জোর গলায় বলতে পারি যে, ইউরোপ আমি যতটা তন্ন তন্ন করে দেখেছি, ভারতের কোন রাষ্ট্রনায়কই ততটুকু দেখতে সক্ষম হ'য় নি। অতএব আমার কথাগুলির প্রতিবাদ করার মত লোক ভারতে আছেন কি না সন্দেহ।

বুলগেরিয়ার যে কোন গ্রাম থেকে তিন মাইল দূরে গোলাবাড়ি রাখবার অনুমতি দেওয়া হয়। সোফিয়ার অতি কাছে একটি চামড়া পরিষ্কার করার স্থান ছিল ব'লে ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে সেখানে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের উপক্রম হয়েছিল। আমাদের দেশের হস্পিটালের সামনে প্রায়ই দরিদ্র অসহায় রোগী অবস্থায় দেখ যায়।

ডাক্তার নার্স এবং অন্যসব পদস্থ কর্মচারী এ রকম বেওয়ারিশ রোগীকেও নিজের দায়িত্বে হস্‌পিটালে স্থান ক'রে দিয়েছেন এমন নিদর্শন আমাদের দেশে দেখা অথবা শোনা যায় না। অতএব আমদের দেশের তুলনা আমাদের দেশের সংগেই দেওয়া চলে। আমাদের দেশের সবই যে 'অতুলনীয়'।

মধ্য ফ্রান্সের রাস্তাঘাট ও জনবসতির অপরিচ্ছন্নতার কারণ অন্বেষণ করেছিলাম। ঠিক ভাবে যা অন্বেষণ করা হয় তার সন্ধান পাওয়া যায়। মধ্য ফ্রান্সের লোক খাঁটি মজুর। প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যে হৃদয়ের যোগ-বিহীন যে সম্বন্ধ, এদের মধ্যে ঠিক তেমনি মানষিক অবস্থা বর্তমান রয়েছে। মজুর ভাল ক'রেই জানে গোলাবাড়ি তার নয়। মালিক যে দিন ইচ্ছা সে দিন তাকে তাড়িয়ে দিতে পারে, অতএব নির্দ্ধারিত সময়ের এক মিনিট বেশি কাজ করে না। ফোর্‌মেনের হুকুম ছাড়া কোনও কাজ মজুররা করতে ইচ্ছুক নয়। সব সময় পর পর ভাব থাকায় কাজের যেমন বিশৃঙ্খলা তেমনি কাজ এগিয়ে যায় না। উত্তর ফ্রান্সে ফ্লিমিশ্‌দের বসবাস বেশি। ফ্লিমিশরা এখনও পুরাতন নিয়ম মতে দৈনন্দিন কাজ করতে ভালবাসে। প্রভুর দুই একটি কটুবাক্য কিম্বা মাইনের কমিবেশিতে বেশি কিছু মনে করে না। ফরাসীরা জাগ্রত জাত, তারা ইসারাতে নিজেদের ভালমন্দ বুঝতে পারে, সেজন্যই মনিবকে পর ভাবে। মালিক এবং মজুরে আন্তরিকতা মোটেই নেই, বরং যা আছে তার নাম পরিস্কার ভাষায় বলা যায় 'শত্রুতা'। যেখানে সর্বকাজে শত্রুতা বিদ্যমান, সেখানে এরকম বিশৃঙ্খলা ও অপরিচ্ছন্নতা যাবে না এবং বিদ্বেষপূর্ণ সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে আছে এবং থাকবেই।

যদিও ফরাসী দেশে কল-কারখানায় মজুরএবং মালিকে শোষক শোষিতের সম্বন্ধের জন্যে বিদ্বেষপূর্ণ সম্বন্ধ পরস্পরের মধ্যে আছে, তবুও

বিপ্লবের গন্ধ আছে বলে মনে না। ফরাসীরা বিপ্লব পছন্দ করে। বিপ্লবের বোধ হয় নির্দিষ্ট নময় থাকে, সেই সময়ে না পৌছানো পর্যান্ত কেউ কিছু করতে সাহস করে না। ফ্রান্সে কূট-নৈতিকের অভাব নেই। সাম্প্রদায়িকতা লোপ পেয়েছে বললে নিশ্চয়ই দোষ হবে। অনেক সভায় ফরাসী সংখ্যালঘুর দল বা ফরাসী মাইনরিটি কথা বলতেও সাহস করে না, কি জানি যদি তাতে মুস্কিল হয়। বৃদ্ধেরা কিন্তু এ সবের উর্দ্ধে। তারা কোন কথা বলতে কসুর করে না। প্রোটেষ্টাণ্ট হলে রোমান্ কেথলিকদের বেশ আক্রমণ ক'রে কথা বলে। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের এই সাহস কেন হয় সে কথা সকলেই জানতে চাইবেন। উত্তরে বলছি বৃদ্ধ অথবা বৃদ্ধা যে ধর্মেরই হউন না কেন, কেউ তাদের প্রতি কুব্যবহার বরতে সাহস করে না। শিশু এবং বৃদ্ধের রক্ষণাবেক্ষণ করাই মানব-ধর্ম। আমাদেব দেশে কিন্তু তার বিপরীত দেখা যায়: আমরা গরু এবং ব্রাহ্মণের সেবার জন্যই' জন্মেছি! জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের দুঃখ দেখে আমাদের দেশের বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন। বৃদ্ধের দুঃখ কি ক'বে মোচন হয় তার তখনকার সময়ের মত সন্ধান পেয়েছিলেন এবং জনসমাজকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'পাপ্ করোনা তবেই পুনর্জন্ম হবে না, বার্দ্ধক্যের কথাও চিন্তা করতে হবে না। আবার কেউ উপদেপ দিয়েছেন, 'পঞ্চাশ বৎসর হলেই বনে যাবে'। বনে গিয়ে কোথায় থাকবে, কি প্রকারে জীবন কাটাবে সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নি। ফরাসীরা এসব বাজে হথোর দিকে অগ্রসর না হয়ে দেশবাসীদের বৃদ্ধাবস্থার জন্য পেন্‌সনের ব্যবস্থা করেছিল, সেই ব্যবস্থা এখনও সেখানে চলছে এব' ভবিষ্যতেও চলবে। যত কাল তারা বনে জঙ্গলে বেড়িয়েছে, ঝলসে রুটি খেয়েছে, ততকাল বৃদ্ধের কথা চিন্তাও করে নি, কিম্বা হামবড়া ভাব কাউকে দেখায় নি।

পশ্চিম ইউরোপের বৃদ্ধাদের পোশাক খোকা এবং খুকীদের মত। হয়ত মাথার টুপি লাল এবং পায়ের মোজা সাদা, কামিজ প্রায়ই রং বেরঙের। পায়ের জুতাও যাতে সহজে খোলা যায় তার ব্যবস্থা থাকে। যারা নিশ্চিন্ত মনে খাওয়া ও থাকবার জায়গা পায়, তাদের বিশেষ ভাবে সাজগোজ করতে হয় না। যাদের খাদ্য এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা ষ্টেট্ করতে বাধ্য, তারা যে কত সুখী আমাদের দেশের লোক ধারণাও করতে পারবে না। পশ্চিম ইউরোপের বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের মধ্যে দান করার প্রবৃত্তি খুবই বেশী। দান করার প্রবৃত্তি কোথা হতে আসে, সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা জানে, সপ্তাহের শেষে পেন্‌শন্ বাবদ যা পাবে তাতে সবটা খরচ হবে না এবং তা ছাড়াও আজীবন তাদের পেন্‌সন চলবেই, সেজন্যে তারা অল্প বিস্তর দান করতে কুণ্ঠিত হয় না।

কোয়েস্তিন সহর বেশ বড়। সর্ব্বত্র কাফে রেঁস্তোরা আমোদ প্রমোদের স্থান, এ সব আমার মনকে কিন্তু আকর্ষণ করতে পারে নি। এটা একটা একঘেয়ে উচুনীচু বিশ্রী সহর, মজুরদের আড্ডা এবং প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে নানা কুৎসিত ব্যবসার স্থান। শিক্ষিত সভ্য ও মার্জ্জিত রুচি ভদ্রলোকের দেখা সাক্ষাৎ এখানে সম্ভব নয়। সেইজন্যে এই সহর থেকে বের হয়ে প্যারীর দিকে রওয়ানা হওয়াই পছন্দও করেছিলাম। সহরতলীতে প্রায়ই বড় বড় রেস্তোরা দেখা যায়। সহরতলীর বাতাস পবিত্র এবং সহরে হৈ-হল্লা মোটেই না থাকায়, বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা সহর-তলীতেই বিকাল বেলা কাটিয়ে আসেন।

ওখান থেকে বেরিয়ে, খানিকটা দূর যাবার পরই মস্তবড় রেস্তোরা পেলাম। অনেক লোক সেখানে বসেছিল। এদের পোশাক এবং নির্ব্বাক অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল হয়ত সবাই পেন্‌সন্‌প্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং

বৃদ্ধা। কাছে গিয়ে দেখলাম, আমার ধারণা ঠিক হয়েছে। সময় নষ্ট না ক'রে প্রত্যেকের সামনে এক খানা ক'রে ভিক্ষাপত্র রেখে দিয়ে আমিও একটি চেয়ারে বসলাম এবং বয়কে এক পেয়ালা দুধ দিতে বললাম। দুধ খাওয়া শেষ করার আগেই বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধারা আমার টেবিলের উপর যার যা ইচ্ছা দিয়ে যেতে আরম্ভ করলেন।

আমারা চেষ্টা করি ঈশ্বরকে ঘুস দিয়ে পিতৃপুরুষকে স্বর্গে পাঠাতে। ফরাসীরা তা পছন্দ করে না। তারা প্রার্থনা করে ঈশ্বর দয়া যেন তাদের পূর্বপুরুষকে ক্ষমা করেন। দান তারা করে, ফলের আশা না রেখে। অথচ আমাদের দেশেই নিষ্কাম কর্মযোগের সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা কত সকামবাদী হয়েছি ভাবলে অবাক হতে হয়। এরও কারণ খুজে বের করতে হবে। ভারত ভ্রমণে তার একটি হদিস নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। যে সকল বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আমাকে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা স্বর্গে যাবার জন্য দান করেন নি, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্যের অনুরোধে দান করেছিলেন।

আমার গন্তব্যস্থল প্যারী। প্যারী তত কাছে নয়। আরও পাঁচদিন চলার পর প্যারী নগরে পৌছতে সক্ষম হব এই ছিল ধারণা। সাধারণ লোক বিদেশী ভাষা মোটেই বুঝতে রাজি ছিল না। সেজন্যে আরও কষ্টে পড়তে হয়েছিল। বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পবন বেগে পথ চলতে আরম্ভ করেছিলাম। পথিক বলছিল, "বাইসিলেত্‌ তুায় দু মন্দে' অর্থাৎ দ্বিচক্রযানে পৃথিবী ভ্রমণ। এদের কথা শুনে সুখী হই নি। আমার শরীরে কত শক্তি পরীক্ষা দিতে অথবা দেখাতে বিদেশে যাই নি। বিদেশে গিয়েছিলাম দেখতে এবং জানতে।

পথে দুটি গ্রাম পড়ল। গ্রাম দেখে তৃপ্ত হতে পারি নি। গ্রাম

পরিষ্কার ছিল না। ফুট-পাথের অর্দ্ধেকটা পরিষ্কার করতেই মজুরদের নির্দ্ধারিত সময় কেটে গিয়েছিল, সেজন্যে বাকিফুটপাথ সে দিন আর পরিষ্কার হয় নি, আগামী কাল বাকিটুকু সাফ করা হবে, এটাই বুঝতে পেরেছিলাম।

মনের মধ্যে কতটা ফাঁকিবাজি ও দুষ্টুমি থাকলে মানুষ সময় থাকতেও কাজকে অর্দ্ধেক করে পরের দিনের জন্যে বাকীকাজ ফেলে রাখে এই সব মজুরদের কাণ্ড দেখে সেটা সহজেই বুঝলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার পর যখন (১৯৩৮-১৯৪৫) ফরাসী-সৈন্য জার্মানদের কাছে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল, তখন ঐ গ্রামের লোকরাই জার্মানদের হয়রান করেছিল। গ্রামের লোক মনে করেছিল, গ্রাম তাদের, অতএব গ্রাম রক্ষা করা তাদেরই কর্তব্য।

সন্ধ্যার আগেই একটি গোলাবাড়ির কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। এই গোলাবড়িটির বিশেষত্ব ছিল মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে একটি বাড়ি। বড় রাস্তা থেকে একটি ঘোড়াটানা গাড়ি চলতে পারে এমন চওড়া রাস্তা ছিল। রাস্তাটি গ্রেভেল পাথরে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে সিমেণ্ট দিয়ে গ্রেভেল পাথরকে আটকে রাখা হয়েছিল। এই রকমের বাড়ি আমাদের দেশে হতে পারে না। ডাকাতের ভয়ে এই রকমের তৈরী বাড়িতে কেউ থাকতে রাজি হবে না। একটি ঘরই দুটি ভাগে ভাগ করা। সামনের দিকে লোক থাকে, পেছনের দিকে রান্না এবং বাথরুম-এর ব্যবস্থা ছিল। রান্নাঘরের পেছনে প্রকাণ্ড একটা হে ঘাসের স্তূপ। হে-ঘাস খড় নয়। যত্ন ক'রে এরও চাষ করতে হয়। আমাদের দেশে সর্বত্র হে ঘাস দেখা যায়, কিন্তু কে তার সন্ধান রাখে? কিম্বা কারা সেই ঘাস চাষ করে গরুকে খেতে দেবে। গরুকে খড় এবং খইলের জল খাইয়ে আমাদের দেশের কৃষক মনে করে, গরু বেশ খেয়েছে। এটা কিন্তু

ভুল ধারণা। গরুকে কখনও খইল খেতে দিতে নেই, এতে দুধের সার মৌলিকত্ব নষ্ট হয়। অনেকে হয় জানে না, কিন্তু জেনেও লাভ কি? সকলের সংগে চলতে হয়।

যদিও প্যারীতে পৌঁছবার জন্যে তখন খুবই চেষ্টা করছিলাম কিন্তু পেরে উঠছিলাম না।পা চলছিল না, মনে হয়েছিল পায়ে ঠাণ্ডা লেগেছে। পূর্ব এশিয়া ভ্রমণ করে ব্রহ্মদেশের ভেতর দিয়ে আসামে প্রবেশ করি। ইচ্ছা ছিল শ্রীহট্ট হয়ে কলিকাতায় পৌঁছি কিন্তু আমাদের দেশের শিলং পাহাড় থেকে শ্রীহট্টের পথে সাইকেল থেকে পড়েগিয়ে আমার বা পা ভেঙ্গে গিয়েছিল। সেজন্যে দুইমাস হস্‌পিটালে থাকতে হয়। তারপর আবাব ভ্রমণ আরম্ভ করেছিলাম। শ্রীহট্ট থেকে আরম্ভকরে আফগানিস্থান, পার্সিয়া, সিরিয়া লেবানন, তুর্কী, বুলগেরিয়া, যুগো-শ্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লাভাকিয়া, জার্মানী, হলেণ্ড, বেলজিয়াম এবং উত্তর ফ্রান্সের মধ্যে পায়ে কোথাও কিছু কষ্ট হয় নি। কিন্তু প্যারীর কাছে এসেই মনে হচ্ছিল বাঁ পায়ের ভাঙ্গ হাড়টা যেন আবার ভেঙ্গে গেছে। সেজন্যে তাড়াতাড়ি ক'রে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটাকে ভরদিয়ে পথের পাশে একটি ইন-এ প্রবেশ করি। ইন-এর একটি রুমের ভাড়া দশ ফ্রাঙ্ক। পাঁচ ফ্রাঙ্কের দু'খানা নোট পথের উপর দাঁড়িয়ে হোটেলের মালিককে দেবার পর অন্য আর একজনের সাহায্য নিয়ে ইনএ প্রবেশ করেছিলাম; সাহায্য কারীকে আমি ডাকি নি, তিনি নিজেই এসে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। সাইকেল খানা তিনিই আমার রুমে রেখে দিয়ে ছিলেন। বয়কে ডেকে গরম জল আনিয়ে তাতে পা ডুবিয়ে রেখে বেশ আরাম পেয়েছিলাম এবং পরে সাদা মদ দিয়ে এক টুকরো ন্যাকড়া ভিজিয়ে পা বেঁধে রাখতে হয়েছিল। ঘণ্টা খানেক পরেই মনে হচ্ছিল ভাঙা হাড়টা যেন জোড়া লেগেছে। পা

পরীক্ষা ক'রে দেখলাম ব্যথা মোটেই নেই, হাঁটতে পারি। উঠে বসলাম বিছানাতে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করি নি, কি জানি যদি বয় আসে এবং দরজা খুলে দিতে বলে। খানিকক্ষণ পরে বয় এসেছিল এবং জিজ্ঞাসা করেছিল, খাদ্যের বন্দোবস্ত করবে কি না? পা অনেকটা আরাম হয়েছিল তবুও বিছানা থেকে উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিলনা। খাদ্যের প্রশ্ন পরিত্যাগ ক'রে বয়ের কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম— ওখানে থেকে আগামী কাল দুপুরের আগেই প্যারীতে পৌছুতে পারব কি না?

বয় চ'লে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে আমার আগেকার চেনা সেই গ্রীক বন্ধু আমার খোঁজে এখানে এসেছিলেন। তিনি কেন যে আমার পেছন নিয়েছিলেন তা মোটেই বুঝতে পারছিলাম না। প্রাইয় তিনি ফরাসী দেশের সোলিষ্টদের প্রশংসা করতেন। ফরাসী দেশের ধনীরা সবাই সোসালিষ্ট তারা মিলের এবং কয়লার খনির মালিক ও এক্সপোর্টার। জমিদার বলতে তাদেরই বুঝায়। ইউরোপের জমিদার হওয়া কত পাপজনক কাজ ইউরোপ না দেখলে কেউ বুঝবে না, তবুও আমার বন্ধু কেন যে সোলিষ্টদের ভক্ত তা বুঝতে পারছিলাম না। তাঁকে দেখা মাত্র রাগে ও ঘৃণায় আমার শরীর কাঁপতে আরম্ভ করেছিল। ভাবছিলাম এই দুঃসময়ে এই শয়তানটা এখানে কেন এল? কি ক'রে আমাকে খুজে বের করলে? লোকটা যুবক তাঁর সর্বাঙ্গে যৌবন প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল, আমার শরীর থেকে তখন যৌবনের চিহ্ন পর্য্যন্ত বিদায় নিতে চলছিল। ইউরোপের ডিমোক্রেসীকে কখনও মানতাম না। বুঝতে পেরেছিলাম—ডেমোক্রেসির আড়ালে ধনতন্ত্রবাদ লুকিয়ে আছে, লুকিয়ে থাকবার সুযোগও রয়েছে। ডিমোক্রেসী বাস্তবিকই ধনতন্ত্র-বাদের আর একটা রূপ এবং ব্যাপকভাবে সাধারণ মানুষকে শোষণ ও

ফতুর করার একটি সুন্দর কৌশল। জার্মাণী, হলেও, বেলজিয়াম্ ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন এই কয়েকটি দেশেই ডিমোক্রেসীর রাজত্ব। সোশ্যালিষ্টরাও ডিমোক্রেটিক, সেজন্যে এদের কথা উঠলেই আমার ঘৃণা ও বিরক্তি হ'ত। যারা আমার মত সাধারণ মানুষকে অন্ন বস্ত্র থেকে বঞ্চিত করে, তাদের কথা উঠলেই ঘৃণা হওয়া স্বাভাবিক। যে লোকটা নিজে গ্রীক, অথচ ফরাসী সোস্যালিষ্টদের পক্ষপাতী, আমার পেছন নেবার তার কারণ কি? পরের দিনও এই যুবক আমার সংগ নিয়েছিল।

পরের দিন আবার পথ ধরলাম। প্যারীতে চলেছি, কত আনন্দ। আমার মত দরিদ্র লোকের পক্ষে ধনীপুত্রদের বর্ণিত প্যারী দেখা সম্ভব ছিল না। প্যারী দেখা সম্ভব হতে চলেছে শুধু নিজের পরিশ্রমে। এ বিষয়ে যদি কাউকে ধন্যবাদ দিতে হয় তবে আমার একগুঁয়েমীকেই ধন্যবাদ দিতে হবে। আমার সাহায্যকারীরূপে কেউ ছিলেন না। এখন মনে হয় তখন যদি কেউ টাকা দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেন, তবে যে কঠোর ও তিক্ত অভিজ্ঞতা ফ্রান্সে অর্জন করেছি সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না।

একটি ছোট্ট গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলাম। বড় রাস্তাটা গ্রামের ভেতর দিয়েই চলে গিয়েছিল। গ্রামের গঠন এবং লোকের বসতি দেখলেই মনে হয় কোনও বড সহর কিম্বা নগরের কাছে এসেছি। পথের দু পাশে নানা শ্রেণীর গাছের সারি। তখন গাছগুলির নতুন ডালগুলো কেটে ফেলা হয়েছিল। তাদের পুনরায় কচি পাতায় ভরা কতকগুলি নতুন নতুন ডাল বেরিয়েছিল। শীতের স্পর্শে পাতাগুলি আধমরা হয়েছিল। এখানে বাড়ি ঘর যদিও নতুন, তবুও পুরাতনের ছাপ তাদের গায়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এসমস্ত বাড়ি ব্যবসাদার ধনীদের তৈরী—তারাই এসবের মালিক। অপরকে ভাড়া দেবার জন্যে এই সব

বাড়ি তৈরী হয়েছে। ভাড়াটেরা হোমরা-চোমরা অথবা কেউ কেটা নয়। তারা নিতান্তই সাধারণ লোক। তাদের মধ্যে সব সময়েই অবসাদের চিহ্ন দেখা যায়।

আবার দেখা হল সেই পূর্ব পরিচিত গ্রীক বন্ধুর সংগে। তিনি মোটরে ক'রে প্যারীতে যাচ্ছিলেন। দুজনে একটি রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করলাম। বন্ধুর মুখে পলিটিক্স লেগেই ছিল। আমার এসব কথা ভাল লাগছিল না। কি ক'রে ভাল লাগতে পারে? আজীবন পেটি বুরজুয়া সুলভ ধর্ম চিন্তা ক'রে এসেছি, ভ্রমণ সময়ে যা দেখেছি তার মধ্যে সবটাই অর্থনীতি ছিল না। নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান ছিল আমার চিন্তার বিষয়। অবশ্য পলিটিক্স সবটাতেই আছে এবং থাকবে। তবুও যখন প্রিমিটিভ যুগের সভ্যতা নিয়ে বিদেশের সংগে আমাদের দেশের তুলনা করতাম তখন ইউরোপের পলিটিক্স তত তলিয়ে দেখতে পারতাম না। এখানে বিদ্যাবুদ্ধির কথা মোটেই আসে না, আসে স্বদেশ-প্রেমের অন্ধ মমতা। স্বদেশ থেকে যত দূরে যাওয়া যায় ততই স্বদেশপ্রেম বাড়ে এবং সেই সংগে "হুম্ সিক্" মনকে অধিকার ক'রে বসে।

গ্রামের ভেতর দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন একটি দৃশ্য দেখে অবাক হতে হয়েছিল। আমরা সাধারণতই 'চীনারা সাপ ব্যাঙ খায়' বলি এবং সেজন্যে তাদের ঘৃণা করি। পথের পাশে একটি লোক শামুক বিক্রি করছিল। অনেকেই সিদ্ধ-করা সামুক কিনে খাচ্ছিল, এবং শামুকের খোল পথের এক পাশে রেখে দিচ্ছিল। মরা শামুকের খোল থেকে পচা গন্ধ রাজপথে ভেসে আসছিল। দৃশ্যটি দেখে যদিও ঘৃণা হচ্ছিল, তবুও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করি নি। কোনও দেশের খাদ্যকে ঘৃণা করতে নেই। আমাদের দেশেও কলিকাতা সহরে বড় বড় বাজারে শামুক ও কুঁচে-সাপ খাদ্যরূপে বিক্রী হয়। ফরাসীদের কাছে এক রকম বড় বড় ব্যাঙ্ বেশ

উপাদেয় খাদ্য। লণ্ডন নগরীতে কুমীরের মাংস বেশিদামে বিক্রী হয়ে থাকে। এটা ভেবে দেখবার বিষয় যে, বিদেশী খাদ্যের সমালোচনাতে আমরা এত উৎসাহী কেন? নানা দেশের মনুষ্যতত্ত্ববিদ্‌রা সে ব্যাপারটা ভালবাবেই জানেন। এখানে আমি সে সব কথা সমালোচনা করতে অক্ষম। কারণ এটা হল ভ্রমণ-কাহিনী। ভ্রমণ-কাহিনীতে ঐ সব প্রসঙ্গ অবান্তর।

এবার আমরা প্যারী নগরীর খুবই কাছে এসে পৌছেছি। লোকের ভিড় ক্রমেই বেড়ে চলছিল। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে গিয়ে বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করছিল। কাজেই আমার ভ্রমণসংগীকে সংগে নিয়ে একটি রেঁস্তোরায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমার সাথী গ্রীক বন্ধু মোটর পরিত্যাগ ক'রে বাইসাইকেল চেপে চলছিলেন। ওখানে সাইকেল সর্বত্র ভাড়া করতে পাওয়া যায়। অপরিচিত লোক সাইকেলের দাম জমা রেখে যে-কোনও দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া নিতে পারত।

বৃষ্টি থেমে গেল। ক্রমেই আমরা সহরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সহরে প্রবেশ করার পর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বন্ধু এবার কোন দিকে?' বন্ধু বললে, 'সেলভে দু সেলুই যাওয়া হবে না, আজ আমরা হোটেলে থাকব।' হোটেল ঠিক করা হল, দুজনে দুটো আলাদা রুম ভাড়া করলাম। আমার সাথী রুমেতেই বিশ্রাম করতে চেয়েছিলেন। আমার কিন্তু রুমে আবদ্ধ হয়ে থাকতে ভাল লাগছিল না। দু এক জন ভারতবাসীর ঠিকানা আমার নোট-বই-এ লেখা ছিল, তাদের সন্ধানে বের হব মনে করেছিলাম। কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ পুলিশ এসে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে আরম্ভ করলে। উত্তর যা দেবার তা দিয়েছিলাম, তারপরই হোটেলের কার্ড নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি। সাইকেলে ক'রে যেদিকে যেতে ভালো ব'লে মনে হচ্ছিল, সেই দিকেই

চলেছিলাম, কিন্তু কোথাও সেখানকার লোকদের মধ্যে স্বচ্ছল অবস্থার জলুস ও ঝলকানি দেখতে পাই নি। দেখলাম সবজায়গাতেই জনসাধারণের অভাব ও দারিদ্র্যের ছাপ। মনে হল—'এই কি সেই প্যারী? যার কথা শুনে আমাদের দেশের লোক আবেগ উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠে?' হোটেলে ফিরে গেলাম এবং সেখানে থেকে সেই রাতটা কাটিয়ে পরের দিন 'সেলভে দু সেলুই' রওয়ানা হলাম। সাথী তাঁর বাইসাইকেল যে কোম্পানীর কাছ থেকে ভাড়া করেছিল সেই কোম্পানীরই একটি ব্রাঞ্চে বাইশাকেল জমা দিয়ে সেদিনের ভোরের ট্রেনেই লণ্ডন রওনা হয়ে গেল। যাবার সময় ব'লে গিয়েছিল, "বন্ধু এখান থেকে লণ্ডন পর্যান্ত ট্রেনে যাওয়াই ভাল হবে। ফরাসী দেশ অনেক দেখেছেন। আর যা দেখার আছে এখানেই দেখে নেবেন, লণ্ডনে আমার সংগে আবার দেখা হবে।"

'সেলভে দু সেলুই' যাবার পথে পুলিশ আমাকে অন্তত দশ বার পথে থামিয়ে রেখে ছিল। তারা আমার কাছে কি চাইত তা বলত না। কোথাও এক ঘণ্টা, কোথাও আধ ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে ছেড়ে দিত। অবশ্য পথে অনেক সুন্দর বাড়ি এবং উত্তম ফুটপাথযুক্ত চওড়া রাস্তা পড়েছিল। এসব জমকালো বাড়িতে গিয়ে থাকবার মত "অস্ত্র" আমার কাছে ছিল। পথগুলি শুধু দেখেই ছিলাম মাত্র এবং বাড়িগুলিতে এক দিন বেড়াতে যেতে হবে তাও ঠিক করেছিলাম।

সেলভেশন্ আর্মির বাড়িতে দৈনিক তিন ফ্রাঁ দিয়ে থাকতে হয়েছিল, বড় হোটেলে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। অনেকেই জিজ্ঞাসা করবেন—আমার 'কেন এই বৈরাগ্য?' ধনীদের কথা জানবার শোনবার কোন ইচ্ছা আমার আদৌ ছিল না। সমাজে নীচের স্তরের মানুষরা কেমন ভাবে দিন কাটায় সে সব চাক্ষুষ দেখাই ছিল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। লণ্ডন,

নিউইয়র্ক, প্যারী, বার্লিন, টোকিও, সাংহাই পিকিন প্রভৃতি বড় বড় সহরের বড় বড় হোটেলে দু এক রাত ক'রে যে কাটাই নি, তা বলা চলে না প্রফেসর, ঔষধের ডাক্তার, সাহিত্যিক ডক্টর, ধনী ব্যবসায়ী এ সবের সঙ্গে যে আলাপ পরিচয় হয়নি তাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু সুরুচি ও কালচারের মুখোস-পরা এই সব ছদ্মবেশী শয়তানদের সঙ্গে মনের মিল হত না। গরীব জনসাধারণ এ সব সহরে দারুণ দুর্দ্দশায় দিন কাটায়। তাদের অনেক সময়ে পেটে অন্ন ও পরণে কাপড়চোপড় জোটে না। যখন আমি এই সব কালচারগর্ব্বী ও মার্জ্জিতরুচির মুখোসপরা ধনিক সাহিত্যিক ডাক্তার ও বৈজ্ঞানিকদের বলতাম—'ঐ দেখ শিশু কাঁদছে, বৃদ্ধ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না'—তখন এই শয়তানরা বলত—এই সব লোকগুলো দুঃখ কষ্ট ভোগ করবার জন্যেই ত জন্মেছে। অনাহারে বস্তিতে থেকে ও ছেঁড়া জামা কাপড় পরে কষ্টের জীবন কাটাবার জন্যেই ত ওদের বরাতে লিখা রয়েছে। এটাই হল এদের প্রাণের কথা।' গরীব দীন দুঃখীর কষ্ট ও দুর্গতিকে তারা এই রকম উপহাস ও বিদ্রূপের চোখেই দেখে। শীতপ্রধান দেশে না খেয়ে থাকা যে কত কষ্ট তা ওরা বুঝবে কি করে?

আমার পুস্তক পড়ে অনেকেরই ধারণা করেন আমি বিদেশের ধনী তথাকথিত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকে সাক্ষাৎ সংস্পর্শে আসি নি। তাঁদের এই ধারণা একেবারে ভুল। আমি দেখেছি অনেক সাহিত্যিক সুন্দর সুন্দর গল্প লিখে নামজাদা বড় বড় সংবাদপত্রে তাদের প্রবন্ধ প্রকাশ করতে সক্ষম হয় এবং সাধারণ লোক মনে করে তিনি কত মহৎ। কিন্তু তাদের সংস্পর্শে একবার গেলে বুঝতে পারা যায় তারা কতবড় শয়তান, কত দুর্জ্জন ও মিথ্যাবাদী। জনসেবার নামাবলী গায়ে দিয়ে এই সব ধূর্ত্তও ভণ্ডরা সমাজে 'দরিদ্র ও দলিতের বন্ধু' সেজে নাম যশ ভোগ

করে। মুখে বেশ এবং মিষ্টি লম্বা কথা কিন্তু ভেতরে স্বার্থপরতা ঘৃণা ও কুটিলতা। এদের নাম করে আমার কলমকে কলঙ্কিত করতে ইচ্ছুক নই। তবে ভালমন্দ নিয়ে সংসার, শয়তানদের মধ্যেও অবশ্য এমন দু' একজন লোককে দেখেছি তাঁরা সত্যিই দরিদ্রের প্রতি দরদ দিয়ে লেখেন এবং সে সব লিখতেও ভালবাসেন। আমাদের দেশে বিনয়ের পরিণান এত নীচ স্তরে নেমে গেছে যে সে কথা আমি জানতাম না। যদি জানতাম তবে পূর্বের গ্রন্থগুলিকে সংক্ষেপ ক'রে হয়ত অন্য রকমের কথা ব'লে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ চল্লিশ পাতার পুস্তকে সীমাবদ্ধ করতে পারতাম এবং আজ আমি মস্ত বড় একটি সরকারী চাকরি নিয়ে আরামে দিন কাটাতে সক্ষম হতাম। আমার সে ক্ষমতা ছিল এবং এখনও আছে, কিন্তু সে-পথে যেতে ঘৃণা হয়। সে পথে ধনীদের চাটুকারী এবং ক্ষমতাওলাদের পদলেহনই সফলতালাভের একমাত্র উপায়। সেজন্যই প্যারীর মত বড় সহরে সেলভে দু সেলুই অর্থাৎ দরিদ্রের আড্ডাতেই আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেখানকার বাসিন্দা সরল সোজা লোকদের কাছে প্রাণখোলে কথা বলে আনন্দ পেতাম।

সেলভে দু সেলুই (সেলভেশন আর্মির একটা কেন্দ্র) বাড়িটার অন্য আর একটা নাম পূর্বে ছিল, বর্তমানে আছে কি না জানি না। কিন্তু সেই নাম পরিবর্তন করে কতকগুলি দরিদ্র এবং শিক্ষিত লোক বাড়ির নূতন নাম দিয়েছিল ইম্পিরিয়াল্ পালেস্।

ছোট্ট রুম। খাটের উপর পাতলা বিছানা সাজানো। শেষ রাত্রে শীতের দাপট সহ্য করতে না পেরে অনেকেরই ঘুম ভেঙ্গে যেত। আমারও ঘুম ভাঙ্গত, সেজন্যে একটু দুঃখিত হতাম না, জানতাম কত গরীব ফরাসী পরিবারের লোক লেপ-কাঁথা কম্বলের অভাবে আরামে ঘুমাতে পারে না। 'সাম্য মৈত্রী, স্বাধীনতা' ফরাসী রাষ্ট্র-বিপ্লবের এই

তিনটি শব্দ কোনও সময়ে চিৎকার করে বলা চলত এখন শোষণ-বাদীদের সংস্পর্শে ঐ তিনটি মহান শব্দ সমস্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা হারিয়ে উপহাসের বিষয় হয়ে পড়েছে।

প্যারী

সেলভেসন্ আর্মির বাড়িতে বাসা নেবার পরই অনেক লোকের সংগে পরিচয় হয়েছিল। এখানে একটি লোকের নাম বলছি—সেই ভদ্রলোকের নাম—কুসুম পাল। তিনি ছিলেন আমার একই জেলাবাসী। শ্রীহট্টের মৌলবীবাজার সাবডিভিসনে তাঁর বাড়ি ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুদ্ধবন্দী কেম্পে তাঁর মৃত্যু হয়। কুসুম পাল মার্কস্‌বাদ মোটেই জানতেন না, ছিলেন একজন পাকা জাতীয়তাবাদী। ঈশ্বরে তাঁর গাঢ় বিশ্বাস ছিল এবং স্বদেশকে এতই ভালবাসতেন যে, আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার আগেই তিনি কতকগুলি ইউরোপীয়ান্ রাষ্ট্রের সংগে যোগাযোগ স্থাপন ক'রে নিজের দেশকে বিদেশী শাসন হতে মুক্ত করবার জন্য উদ্‌যোগী হন। তাঁর ধারণা ছিল, স্বাধীনতা পেলেই ভারতের উন্নতি হবে এবং আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জল হবে। সাম্য, মৈত্রী স্বাধীনতার দেশ ফ্রান্সের রাষ্ট্রকেন্দ্রে তিনি যখন আমাকে নিয়ে গরীবদের পাড়াতে ভ্রমণ করতেন, তখন তিনিও তাদের দারিদ্র্য দেখে চোখের জল মুছতে বাধ্য হতেন এবং ভাগ্যের উপর সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজের বাড়িতে বসে বিদেশী রাষ্ট্রনৈতিকদের সংগে কথাবার্তায় সময় কাটাতেন।

কুসুম পাল প্যারীতে থাকতেন এবং মাঝে মাঝে ইউরোপের সর্বত্র ঘুরে বেড়াতেন। এক দিন তাঁকে মস্কো যাবার কথা বলেছিলাম। তাঁর উত্তরে তিনি বলেছিলেন : "মাইকা ব্যবসায়ীর পক্ষে মস্কো যাওয়া কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। তারপরই বলছিলেন আমাদের অজিত সিং মস্কো যান না কেন, সে সংবাদ আপনি রাখেন কি ?

অজিত সিং বার্লিনে থাকতেন এবং সেই পুরাতন যুগের বিপ্লববাদের কথা বলে সময় কাটাতেন। তাঁর সংগে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল এবং তিনি রাগ করে বলেছিলেন: "আমরা চাই স্বাধীনতা, এর বেশী নয়।" অজিত সিংহের বয়স হয়েছিল। এতটুকু কথা যে বলেছিলেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখ হ'ত—যখনই কোনও ইউরোপীয়ান্ রাষ্ট্রনৈতিকের সংগে আমাদের রাষ্ট্রনৈতিকদের তুলনা করতাম। ইউরোপীয়ান্ রাষ্ট্রনৈতিক বৃদ্ধ হন আর যুবক হন তাতে আসে যায় না, তাঁরা পুরাতন মতবাদের সংগে নূতন মতবাদের তুলনা করেন, নূতন মতবাদ নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করেন এবং যা গ্রহণের উপযুক্ত তাও গ্রহণ করেন। ইউরোপে যে ব্লক হেডেড্ লোক নেই তা বলা চলে না। স্বার্থপর লোকও যথেষ্ট আছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র।

অজিত সিং এবং কুসুম পাল দু জনে এক স্তরের লোক ছিলেন না। কুসুম পাল যদিও স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন তবুও নূতন মতবাদ মার্কস্‌বাদের সংগে কোনও রকম সম্পর্ক রাখতেন না। তিনি ভাবতেন তাঁর সমশ্রেণীর লোকই ভারতের ত্রাণকর্ত্তা হবার ক্ষমতা রাখে, উপরন্তু ভাগ্য এবং ঈশ্বরে প্রবল আস্থা থাকার জন্য নীচের তলার লোকের সংগে তিনি সম্পর্ক রাখতে পারতেন না। আমাদের নেতাজীর সংগে তিনি কয়েকবারই দেখা করেছিলেন এবং তাঁর সংগে যে সমস্ত কথা হয়েছিল তাও আমাকে বলেছিলেন। উভয়েরই ধারণা ছিল ইণ্ডিয়া বিদেশীর সাহায্য ছাড়া কোন মতেই স্বাধীনতা পাবে না। তাঁরা বিশ্বাস করতেন—ইন্টারন্তসনেল্ পলিটিক্স-এর প্রভাব ভারতের উপর পড়বেই এবং সুযোগ মতে বিদেশীর সাহায্যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীকে অপসারণ করা সম্ভব হবে। বিষে বিষ ক্ষয় মতবাদই কুসুম পাল পোষণ করতেন এবং স্বাধীন হবার পর ডিক্‌টেটর-

সিপের মধ্যমে প্রলিটারিয়েট্ ডিকটেটরসিপের পক্ষপাতী ছিলেন। নেতাজী নাকি সেকথাই কুসুম পালকে বলেছিলেন।

ঈশ্বর এবং ভাগ্য সম্বন্ধে যখন কথা হচ্ছিল তখন কুসুম পাল বলেছিলেন "এসব আপাতত রাখতেই হবে, তারপরই "ষ্টালিন্ ডাইরী" নামে এক পুস্তক হতে কতকগুলি কথা বলছিলেন যা এই পুস্তকে লিখাও চলেনা বলাও চলেনা। প্রকৃতপক্ষে কুসুম পাল নেতাজীকে বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন—দ্বিতীয় যুদ্ধ অতি কাছে এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের সুযোগ কোন মতেই পরিত্যাগ করা চলবে না। স্টালিন ডায়রী পুস্তকখানা ফরাসী ভাষায় লিখিত থাকায় তাতে কি লিখা ছিল বুঝতে সক্ষম হই নি। অনুবাদ করে যা বুঝিয়েছিলেন তাই বুঝতে পেরেছিলাম।

হিটলারের মেইন্ কেম্ফ্ এবং জাপানী বেরণ তানাকা মেমোরিয়েলের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার পর কুসুল পাল লাফ্ দিয়ে সোফা পরিত্যাগ করেন এবং বলতে থাকেন: "আপনি এসব কথা বুঝবেন না; যদি সাহায্য নিতে হয় তবে এদের কাছ থেকেই, রুশিয়াকে হিটলার কোন মতেই ছাড়বে না, একথাও জানি, যদি হিটলার দুই ফ্রণ্ট করেন তবেই হবে তাঁর মৃত্যু। তবুও বৃটিশকে ঘায়েল করতে পারলে সাম্রাজ্যবাদ অটুট থাকবে না। ইতিহাস পড়বেন, নূতন ইতিহাস গড়তে হবে।

কুসুম পাল যেমন দরিদ্র ছিলেন তেমনি দানবীর ছিলেন। আমি যে দিন তাঁর সংগে প্রথম দেখা করি সেদিন তাঁর ঘরে চাউল ছিল না। চাউল বাঙ্গালীর একমাত্র খাদ্য। কুসুম পাল ইউরোপে এত কাল থেকেও ভাতের স্বাদ ভুলতে পারেন নি। ভাতের ব্যবস্থা করার জন্য আমাকে নিয়ে বের হতে যাবেন—ঠিক সেই সময় একজন ইংলিশমেন্ ঘরে প্রবেশ করে এবং পঁচিশ পাউণ্ডের নোট দিয়ে বলে "বড়ই দেরী হয়ে গেল।

গতকল্য সন্ধ্যার ট্রেনে প্যারীতে এসেছিলাম আপনার বন্ধু মিষ্টার—এই টাকাগুলি পাঠিয়েছেন।"

বাহাত্তর ফ্রাঙ্ক তখন এক ষ্টারলিং পাউণ্ডের সমান ছিল। এক ফ্রাঙ্ক-এর কেনার ক্ষমতাও ছিল প্রচুর। মিনিটের মধ্যে কুসুম পাল ধনী হয়ে গেলেন দেখে সুখী হয়েছিলাম। চাউল থেকে আরম্ভ করে মাংস পর্য্যন্ত কিনে যখন ঝি ঘরে ফিরলেন তখন কুসুম পাল সুখী হয়েছিলেন।

কথা-প্রসংগে কুসুম পাল বৃটিশ আই, সি. এসদের বাহাদুরি দিয়ে বলছিলেন: আমাদের দেশটা ইতিমধ্যেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। হিন্দু এবং মুসলমানের দেশ-রূপে। হরিজন এবং শিখদের নিয়ে দেশটাকে আরও বিভক্ত করা যায় কি না তার চেষ্টা চলছে। কলিকাতার ষ্টেট্‌সম্যান কাগজ ক্রমাগত এ কথাই বলছে এবং লণ্ডনের নিউ ষ্টেটসম্যান এর প্রতিবাদ করছে। ধন্যবাদ লর্ড বিভারব্রুককে। যে কলম দিয়ে ইণ্ডিয়াতে ভারতবাসীকে টুকরা টুকরা করে কাটছে সেই কলমের সাহায্যে লণ্ডনের উদার প্রকৃতি লোককে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কেমন সুন্দর ব্যবস্থা ভেবে দেখুন।"

বৃটিশ আই সি এস্ বৃটিশের এক একটি স্টেট্। বৃটিশের উপকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারে না। এমন সুন্দর পোষা কুকুর সাম্রাজ্য-বাদী বৃটিশের আর নাই। ইংলণ্ডেও অনেক দরিদ্র আছে, যারা অর্থাভাবে বহু কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু ভারতের মত দারিদ্র ইংলণ্ডে নাই। সে দেশ থেকে শিক্ষা পেয়ে যারা নিজের জাতের শত্রুতা করে তারা কি কম চিজ, তাদের পরিচয় একটু চিন্তাশীল লোক মাত্রেই বুঝতেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলতে পারতেন না।

এতটুকু শুনার পর কুসুমপালকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম' তাঁর বৃটিশ বন্ধুরা কি তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন ? উত্তরে বলেছিলেন, তখনও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাঁর নাম বিশ্বাসী চাকর লিষ্ট হতে কেটে দেয় নি, সেজন্যই সাহায্য করছে।

এর মানে কি কুসুম পাল ?

এর মানে এখনও আমি কমিউনিষ্ট হই নি অথবা কমিউনিষ্টদের সহানুভূতি দরকার মত গ্রহণ করব না। বৃটিশ কমিউনিষ্টকে হিটলার যত ভয় করেন মুসলিনীকে তত ভয় করেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভাল করেই জানে আমরা যে কোনো রকমের বিপ্লব করি না কেন, কখনও কমিউনিষ্ট হব না, সেজন্যই আমাদের মত লোককে শত্রু জেনেও মিত্রের মতই ব্যবহার করে।

কথা প্রসঙ্গে বললেন "লণ্ডন যাবার পর সকলত ওয়ালার সংগে দেখা করবেন, তিনি হলেন ইংলণ্ডের কমিউনিষ্ট এম, পি, তাঁকে বৃটিশ মোটেই ভয় করে না, তারা জানে যিনি টাটা কোম্পানীর সেয়ার হোল্ডার তিনি যাই করুন না কেন, ধনী ছাড়া আর কিছুই নন্। সকলতওয়ালা একজন ধনকুবের সে কথা কি আপনি জানে না ?"

কুসুম পাল যদিও জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিক ছিলেন তবুও তিনি ভারতীয় ধনীদের বিশ্বাস করতেন না। ভারতীয় ধনীরা অন্য যে কোন দেশের ধনী হতে হীন প্রকৃতির; সেই ধারণা তিনি যেমন ভাবে মনে পোষণ করতেন নেতাজীরও নাকি সেই ধারণাই ছিল, সেজন্যই নেতাজী এবং কুসুম পাল মনে করতেন ভারতে কামাল পাশার ধরণের ডিক্‌টেটরসিপ্ হবার পর প্রলিটারিয়েট ডিক্‌টেটরসিপ্ হবার সুযোগ দিলেই সকল বিষয়ের সুবিধা হবে।

কুসুম পালের হাতে পঁচিশ পাউণ্ড আসা মাত্র তিনি আমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি আমাকে জানতেন না। ভারতবাসীর মধ্যে যত পলাতক রাষ্ট্রনৈতিক বিদেশে পালিয়ে গিয়ে বৃটিশ অত্যাচার হতে নিস্কৃতি পেয়েছিলেন, তাদের অনেককেই সাহায্য করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এমন কি ভিক্ষা করেও সাহায্য করেছি। কুসুম পালের সাহায্য গ্রহণ করতে পারি নি। কুসুম পালের সহায়তায় ফরাসী দেশের ধনী-সম্প্রদায়ের সঙ্গে মেলামিশা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

আমার ধারণা ছিল—প্যারীতে অনেক ভারতবাসীর সাক্ষাৎ পাব, যারা বিদেশে আত্মগোপন করে রয়েছিলেন ; তাঁদের মধ্যে কেউ সেখানে ছিলেন না, অথচ বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট অনেকগুলি ইন্‌ফরমার প্যারীতে পুষত। ঐ রকম একটি পোষা লোকের সংগে দেখা হয়েছিল। লোকটি পোষ মেনেছিল এবং কুকুরত্ব ঠিক ঠিক ভাবে আয়ত্ত করেছিল। দেশজ্ঞান, জাতিজ্ঞান তার ছিল না, বোধহয় লোপ পেয়েছিল। সে লোকটি কুসুম পালের বাড়িতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল এবং যে কত দিন আমি কুসুম পালের বাড়িতে গিয়েছিলাম প্রত্যেক দিন পথে দেখা হ'ত। কুসুম পালকে পাহারা দেওয়াও তার কাজের মধ্যে একটি বিশেষ কাজ ছিল।

আমার মনে হয়, কুসুম পাল এবং নেতাজী এক মতাবলম্বী ছিলেন। ১৯৪০ সালে নেতাজীর দূত আমার সংগে প্রায়ই হারিসন্ রোডের পেলেস হোটেলে দেখা করতেন। আফগানিস্থানে কিরূপে যেতে হবে সেই পথের সন্ধান আমিই তাঁক দেয়েছিলাম এবং প্রত্যেক বারেই নেতাজীকে বিদেশে যেতে নিষেধ করতাম। যে দিন তিনি ভারতবর্ষ থেকে একবারে চলে যান সেদিন আমি ভাগলপুরে ছিলাম। ভাগলপুরের হোটেলের লোক প্রায়ই যাত্রী আনবার জন্য ষ্টেশনে যেত। সেই ধরণের একটি লোক বলছিল—সে নাকি নেতাজীর মত একটি লোককে গাড়িতে বসা

দেখেছিল। কথাটা শোনা মাত্র, আমার মনে কুসুম পাল এবং নেতাজীর যোগাযোগের কথা মনে হয়েছিল।

প্যারীতে যখন ছিলাম তখন লক্ষ্য করতাম সে দেশের লোকের অভাব জ্ঞান কতটুকু আছে। বুঝতে পেরেছিলাম—প্যারীর প্রত্যেকটি নরনারীর অভাব জ্ঞান আছে এবং অভাব মোচনের জন্য যত টুকু চেষ্টা করা দরকার তত টুকু কাজ করে। কিন্তু আমাদের দেশের লোকের অভাব জ্ঞান যদি প্যারীর লোকের এক হাজার ভাগের এক ভাগও থাকত তবেই আমাদের রাজনৈতিক পটভূমির পরিবর্তন হয়ে যেত। ছাতু, লংকা, নুন খেয়ে এবং ফুটপাথে শুয়ে থেকেও যারা দুঃখ বোধ করেন না তাদের তুলনা কোনও সভ্য লোকের সংগে দেওয়া চলে না। সামান্য নূন-ভাত-লংকা যাদের ভাগ্যে একবারও জোটে না তারা লীগ, মহাসভার পক্ষপাতী কি করে হতে পারে, কোনও সভ্য দেশের লোক ধারণাও করতে পারবে না।

প্যারীর নরনারীদের কাছে জিনিসের চাহিদা আছে, আয় আছে, তবে ব্যয় আয়ের চেয়ে বেশি। সে জন্যই তথাকথিত গণনায়ক অর্থাৎ সোসালিষ্ট পার্টি জনসাধারণের কাছে দাঁড়াতে পারে না। গণনায়ক ততক্ষণই গণনায়ক থাকেন যতক্ষণ তিনি জনগণের সুযোগ সুবিধার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

প্যারীতে রোমান্ কেথলিক খৃষ্টান ধর্মেরই প্রচলন। এক দিন পথের পাশে একটি ভারতীয় কাফির দোকানে কাফি খাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখতে পেলাম অনেকগুলি স্ত্রীলোক সাদা পোশাকে আবৃত হয়ে লাইন ধরে পথ চলছিল "প্যারীর লোক কামিজ তৈরী করার মত লংক্লথ পায় না অথচ সিষ্টার্সগণ সর্বাঙ্গ সাদা কাপড়ের পোষাকে সজ্জিত হয়ে পথে চলছিলেন। তাই দেখে সাধারণ লোকের অভাবের কথা একটুও মনে হয় না? এই

প্র কারের মন্তব্য শোনার পর মনে হচ্ছিল ফ্রান্সের লোকের অভাব জ্ঞান অত্যধিক এবং সেজন্য সাধারণ লোক, সরকারের প্রতি কোনও আস্থা রাখে না।

সপ্তাহ অতিবাহিত হয়েছিল, কুসুম পালের সংগে দেখা হয় নি। এক দিন তিনি নিজেই আমার সংগে দেখা করতে এসে বললেন "চলুন আজ একটা বড় রেস্তোঁরায় আপনাকে নিয়ে যাব। চল্লাম তাঁর সঙ্গে। হাটতে হল না মোটেই।

সহরের ঠিক মধ্যস্থলে রেঁস্তোরা। দূর থেকে অথবা ফুট পাথের উপর দাঁড়িয়ে রেস্তোরার সৌন্দর্য্য কিছুই বুঝতে পারা যায় না। ছোট দরজা। মাত্র দু জন লোক এক সঙ্গে প্রবেশ করতে পারা যায়। অতি সন্তর্পণে আমরা প্রবেশ করলাম। একটু গিয়েই দেখলাম এ যে নন্দন কানন ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। মালয় দেশের অথবা দক্ষিণ ভারতের স্কিন্ নয়, সজীবত্ব রয়েছে। ঘরটার এক পাশে একটি ছোট পাহাড় তৈরী করা হয়েছে। পাহাড় থেকে একটি ঝড়না বেড়িয়ে আস্‌ছে। জল ঝম্ ঝম্ করে পড়ছে। পাশেই ট্রপিকেল দেশের ফুলের গাছ। ফুল গাছে ফুল ফুটেছে, ফুল হতে গন্ধ বের হচ্ছে। পাশেই একটি সজীব বেতের ঝাড়। বেতগুলি একটি ছোট গাছের উপর ভর করে আছে। পাশেই এক জন ভারতীয় মহিলা ভারতীয় ধরনে নিত্য করতেছিলেন। ভারতীয় বাদ্য বাজতেছিল। অনেকেই তামিল সুর বুঝতে পারছিলেন না তবুও কলনীয়েল্ গান না বুঝেও অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করছিলেন। মিনিট পাঁচেকের পরই শীতবস্ত্র খুলতে হল। কপাল হতে ঠস্ ঠস্ করে ঘাম বেড়িয়ে আসছিল। জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলাম ঘরের ভেতরের উত্তাপ নব্বই ডিগ্রী, বাইরের উত্তাপ ছিল বাইত্তর ডিগ্রী। তিন ফ্রাংক করে এক পেয়ালা কাফির দাম। কাফির বিশেষত্ব কিছুই ছিল না,

বিশেষত্ব ছিল ঘরের সাজসজ্জার এবং উত্তাপের। শীতের দেশের উত্তাপ বড়ই আরামের। আমরা এক ঘণ্টারও বেশি উত্তাপ উপভোগ করেছিলাম।

এই রেস্তোরাতে যারা আসেন তারা সকলেই হীরার ব্যবসায়ী। মণিমুক্তা ব্যবসায়ী যে আসেন তা বলা চলে না। অনেক হীরা ব্যবসায়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। প্রত্যেকেই তাদের আফিসে যেতে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বাক্যলাপ এতই ধীরে হচ্ছিল যে পাশের টেবিলের লোক ও আমাদের কথা বুঝতে পারছিল না। উৎশৃঙ্খলতা এখানে ছিল না। উপস্থিত সকলেই মাদ্রাজী তাদের প্রতি দোষারূপ চলেনা। এরূপ শব্দহীনতা কম রেস্তোঁরায় দেখছি বল্লে দোষ হয় না। আমাদের আলচ্য বিষয় ছিল বিদেশের আবহাওয়ার কথা। টপোগ্রাফী নিয়ে ও অনেকে সমালোচনা করছিলেন। বর্ম্মার সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। দুঃখের বিষয় কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হলেও কর্ত্তৃপক্ষ যেরূপ অবস্থায় ডাল্ লেকের তীর অপরিস্কার এবং দুর্গন্ধ যুক্ত রেখেছিলেন তাতে বৃটিশ সরকারের সকলেই বদনাম করেছিলেন।

আমরা চলে আসবার সময় আরও এক দল ভারতীয় রেস্তোঁরায় প্রবেশ করতে দেখেই কুসুম পাল বলেছিলেন "এরা হল লণ্ডনের লম্পট। লণ্ডনে তাদের আত্মচরিতার্থ হয় নি, এখানে আত্মচরিতার্থ করতে এসেছে। এরা কেউ প্যারীর বাসিন্দা নয়। এদের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, দু জন আমার পরিচিত। বার্লীন এবং ভিয়েনাতে তাদের দেখছি। এদের পরিচয় জানিয়ে কোনও লাভ হবে না, তবে পাঠকের জ্ঞাতার্থে লিখছি বৃটিশ মহিমা অপার। বাস্তাবিক পক্ষে যারাই বৃটিশকে সাহায্য করে নিজের দেশের শত্রুতা করে, তাদের প্রতি বৃটিশ কখনও বিরূপ হয় না। এর মাঝে এক জনকে বৃটিশই কলিকাতা হতে বিদেশে

পাঠিয়ে ছিল নতুবা তার অবস্থা কানাইলাল এবং সত্যেন বসু নরেন গোঁসাই এর প্রতি যা করেছিলেন সেরূপই হ'ত। কুসুম পাল সব কথা আমার কাছে বলেছিলেন এবং এদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন।

সে দিনই একটি নিষিদ্ধ স্থান দেখবার জন্য যাবার কথা ছিল কিন্তু সেল্‌ভেসন্‌ আর্মির বাড়িতে এক জন রাজনৈতিক লেকচার দেবেন তাতে আমার উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। কুসুম পালকে বিদায় দিয়ে সেল্‌ভেসন্‌ আর্মির বাড়িতে ফিরে গেলাম এবং যখন লেকচার আরম্ভ হ'ল তখন আমার উপস্থিতিতে সকলেই হর্ষ প্রকাশ করলেন। এটাকে বলে উৎসাহীত করা। আমাকে কোন দিকে উৎসাহীত করলেন সভায় উপস্থিত ভদ্রলোকেরাই জানলেন, আমি কিন্তু একটু উৎসাহিত হই নি। ফরাসী কমিউনিষ্ট বকে বেশি, কাজ করে কম। চীনের কমিউনিষ্ট কথা মোটেই বলে না। শুধু কাজ করে যায়। এ কথাই সভার উপসংহারে বলেছিলাম। অপ্রীতিকর কথা বলায় অনেকেই দুঃখিত হন। বাস্তবিক পক্ষে কথা এক এবং কাজ অতি বাস্তব। বাস্তবকে অবহেলা করে কথার মালা গাথতে যাওয়া অন্তত প্রগতিশীলদের শোভা পায় না।

যাদের দরজার সামনে অনবরত ব্যভিচার চলছে তারা কি করে চোখ বন্ধ করে থাকতে পারে আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি? যারাই প্যারীর নাইট ক্লাবের কথা বলে তাদের জেনে রাখা উচিৎ নাইট ক্লাব সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে না, সমাজকে দুর্বল করে। দুর্বল লোকই সমাজের দোষের কথা চর্চা করে আনন্দ পায়। সমাজের প্রতি তাদের যে কর্ত্তব্য আছে ভুলে যায় তারা। প্যারীর নাইট ক্লাব সম্বন্ধে অনেক পুস্তক আছে, আমি বলছি বাস্তবের কথা।

নাইট ক্লাবে কে যায়? ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়ই নাইট ক্লাবে যায়। বর্তমানে ধনতান্ত্রিক দেশের সর্বত্র নাইট ক্লাব

দেখ যায়। লণ্ডন, নিউইয়র্ক, হলিউড্ (লস্‌এঞ্জেল্‌স্) কোথাও নাইট ক্লাবের অভাব নাই। পূর্বে চীণ দেশের সাংহাই, নান্‌কিন্, পিকিন্ প্রভৃতি সহরে নাইট ক্লাবের ছড়াছড়ি ছিল। কলিকাতা, দ্রিল্লী, বোম্বে প্রভৃতি ভারতীয় সহরে নাইট ক্লাবের পত্তন হচ্ছে। ধনতন্ত্রবাদের দোষই হল যাদের কাছে অর্থ থাছে তারা সমাজের ভাল এবং মন্দের কথা চিন্তা করে না। যারা প্যারীর নাইট ক্লাবের দোযারূপ করেন তারা যেন নিজের দেশের নাইট ক্লাব গুলি বেড়িয়ে আসেন তবেই অপরের নিন্দা করা কমে যাবে। প্যারীর অনেক নাইট ক্লাব দেখেছি, এখানে সেগুলির কথা বলা হল না। বিদেশের কুৎসা স্বদেশ বাসীর কাছে বলবার জন্য পৃথিবী ভ্রমণ করতে যাই নি, গিয়েছিলাম বিদেশের গুনাবলী আহরণ করবার জন্য।

অনেকে বলেন ফরাসীরা বেশি কথা বলে। আমার ত মনে হল না তারা বেশি কথা বলে। লক্ষ করে দেখেছি তারা ও ধীরে কথা বলতেই ভালবাসে। আসল কথা হল তারা একটু মিশুক। আপনা হতেই কথা বলতে আরম্ভ করে। এটা জাতের দুর্বলতা নয়, এতে ফরাসীদের মনের প্রশস্থতা বুঝা যায়।

প্রত্যেক দেশের যুবকেরাই বিদেশে যেতে এবং বিদেশের লোকের সংগে পরিচিত হতে ইচ্ছুক। ফরাসী দেশে সেরূপ যুবকের অভাব নাই। অনেক ফরাসী যুবক উপযাচক হয়ে কথা বলেছে এবং হাত বের করে দিয়ে করমর্দন করেছে। এটা ফরাসী জাতির বাহাদুরী। এই বাহাদুরী গ্রীক, ইটালীয়ান্, বুলগার রুশ্, চেক্, স্লাভক্, স্লাভ এবং অন্যান্য মধ্য ইউরোপের উপজাতির মধ্য বেশ প্রচলন আছে, কিন্তু জার্মান্, ডাচ্ বৃটিশ, স্পেনিশ্, এবং পর্তুগীজদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়, এমন কি রুমেনীয়ান্‌দের মধ্যেও এই দোষ রয়েছে। ফরাসীরাও সাম্রাজ্যবাদী,

তবুও তাদের মধ্যে উদারতা দেখলে আপনা হতেই শ্রদ্ধা জেগে উঠে।

অনেকে হয় ত আমার কথা বুঝবেন না, বুঝবার জন্ম বলছি ধরুন দুটা ইংরেজ ছোকরা দাঁড়িয়ে আছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে আছে একটি ফরাসী ছোকরা, ফরাসী যুবকই প্রথমত বিদেশীকে "কেমন আছেন, এখন কোথা হতে আসছেন, কোন দেশে বাসিন্দা জিজ্ঞাসা করবে। ইংরেজ যুবকদ্বয় যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থাকবে। এদের প্রতি আপনা হতেই ঘৃনা জেগে উঠে। কিন্তু এটা ত তাদের দোষ নয় তাদের জাতেরই দোষ হল কথা না বলা। যারা বৃটিশ আচার ব্যবহার জানে তারা ইংলিশ যুবকদ্বয়কে কথা বলতে বাধ্য করবে এবং যা কাজ তাও আদায় করে নেবে। ইংলিশদের মত বাধ্য খুব কম জাতই দেখা যায়। মনে হয় ফরাসীরা যেমন বিপ্লববাদী ইংলিশরা ঠিক তেমনি হুকুম আমিল করার পক্ষপাতী।

সেল্‌ভেসন্‌ আর্মির বাড়িতে প্রায়ই কথকদের দেখা পাওয়া যেত। তারা ফরাসীদের পুরাতন ইতিহাস বলতেন। আমাদের দেশে সেরূপ ব্যবস্থা ছিল না একং এখন ও নাই। ভবিষ্যতে হবে কি না ভবিষ্যৎই ভাল করে জানে।

কাশীর গঙ্গার ঘাটে এবং সেই রকমের যে কোন স্থানে কথকতা হয়, সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় কথকগণ কথা শেষ হয়ে গেলে ডাল, চাল, আটা, শাক, ফল, মূল ভর্ত্তি করে ঘরে ফেরেন। ফরাসী দেশের ঐতিহাসিক কথকগণও ঠিক সেরূপ কথার শেষে কিছু দক্ষিণা পান। ফরাসীদের আর্থিক দিক দিয়ে উন্নত সেজন্ত তাঁরা "ইন্‌ কাইণ্ড" গ্রহণ না করে অর্থই গ্রহণ করেন। ফরাসী দেশের ইতিহাস এক জন প্রফেসর ইংলিশে বলতেন তাঁর লেকচারে যেতাম এবং মন দিয়ে শুনতাম। এটাই ছিল

প্যারীর সেলভেসন্ আর্মির বাড়ির মাহাত্ম্য। ভাবছিলাম এরূপ দেওয়া নেওয়াতে কি প্রফেসর মহাশয়ের সম্মানের লাঘব হয় না ? প্যাটি বরজুয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন লোকের মনে নিশ্চয়ই আঘাত লাগে কিন্তু প্রলিটারিয়েটের পক্ষে এরূপ দেওয়া নেওয়া আনন্দের।

তিনি বলতেছিলেন মস্তবড় লম্বা চৌড়া ইতিহাস। তার কথা হতে যতটুক চুম্বক উদ্ধার করেছিলাম এবং লিখতে যাচ্ছিলাম হঠাৎ একদিন একখানা বাংলা পুস্তক দেখে সে প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করতে হল। ফরাসী মহাবিপ্লব নাম দিয়ে বিশ্বেশ্বর সেনগুপ্ত মহাশয় পুস্তকাকারে আমার শুণা ইতিহাসটুকু ছাপিয়ে ফেলেছেন। পাঠক তাঁর পুস্তকই পাঠ করুন, আমাকে পুনরাবৃত্তি হতে রেহাই দিন।

যাঁরা এই পুস্তকখানা পড়বেন তাঁদের স্মরণ করিয়ে দেই ফরাসী বিপ্লব যাকে মহাবিপ্লব বলা হয়েছে তা ফরাসী দেশে কার্য্যকরী কেন যে হয় নি সে বিষয়ে অনুধারণ করা দরকার। মহাত্মা গান্ধির অহিংস বিপ্লবও কম ছিল না, তা কার্য্যকরী হল না কেন ? ভারতীয় বিপ্লবগুলির সংগে ফরাসী মহাবিপ্লবের বেশী না হক কিছু সাদৃশ্য আছে। বিপ্লব বিপ্লবই একথা সকলেই স্বীকার করবেন। আমার মনে হয় সর্বত্র নেতৃত্বের বিপর্য্যয় হয়েছে। নেতা যে পর্য্যন্ত নিজের স্বার্থ জনগণের স্বার্থের সংগে জড়িয়ে না ফেলেন সে পর্য্যন্ত নেতৃত্ব সঠিক হয় না। লেনিন্, ষ্টালিন এবং মাওসুতনের নেতৃত্ব এক রকমের এবং অন্যান্যদের নেতৃত্ব ভিন্ন রকমের। পরিস্কার করে যদি বিষয়টা বলা হয় তবে বলব—যখনই নেতা নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি করেছেন তা নামের জন্যই হউক অন্যান্য দলগত স্বার্থের জন্যই হউক তখনই নেতৃত্ব ফেল করেছে। ফরাসী মহাবিপ্লবের অসাফল্যের অকাট্যকারী প্রথম কারণ তাই এটা অবস্য আমার ধারণা যারা ঐতিহাসিক তাঁরাই এ বিষয়ের অধিক কারণ নির্ণয় করতে

পারবেন। আমি ঐতিহাসিক নই সেজন্যই এবিষয়ে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হলাম না।

আমাদের দেশে খবরের কাগজের মালিকরা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে কোনও অবস্থায় লেখকদের কাছ থেকে প্রবন্ধ ছাপবার জন্যে নেন বটে—কিন্তু ইউরোপের লিখক যে মজুরী পান সেরূপ মজুরী দিতে কার্পণ্য করেন। অবশ্য কোন কোন পত্রিকা প্রতিষ্ঠানে এই ব্যাপারে কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপে কিন্তু সে রকম নিয়ম নাই। যে কোন সংবাদ-পত্র ছোট বড় প্রবন্ধের জন্য লেখককে টাকা দেন। এক জন লেখকের জোগাড় করা সংবাদ যদি অন্য কোন লেখক সংবাদ-পত্রে দিয়ে আসেন তবু তার জন্যে মজুরী দেওয়া হয়। কুসুম পাল এবং আরও কয়েক জন স্বদেশবাসীর সঙ্গে প্যারীতে সময় কেটে যাচ্ছিল। সংবাদ-পত্র আফিসে যাবার ফুরসৎ ছিল না। এ দিকে আমার কথা প্যারীতে অনেক সংবাদ-পত্রে ছাপা হয়েছিল। বিভিন্ন রকমের লোক সেজন্য আমার সংগে প্রায়ই দেখা করতে আসত। আমি ভাবতাম কুসুম পালের বদান্যতায় আমার কাছে লোক আসছে, কথা বলছে, যারা কথা বলতে পারছে না, তারা দুভাষীর সাহায্যে কথা বলছে।

এক দিন সুইডেন্‌বাসী একটি লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "সংবাদ-পত্র থেকে আপনি কত ফ্রাংক পেয়েছেন? অবাক হয়ে তাকে বললাম "এক ফ্রাংকও নয়।" লোকটি আমার চেয়েও বেশি অবাক হয়ে বলছিল, "আপনাকে কেউ এক্সপ্লয়েট্ (আর্থিক শোষণ) করছে, "যাক্‌গে আপনার কাছে আমার কিছু বক্তব্য আছে, শুনে রাখুন, দরকার হ'লে কাজে ব্যবহার করবেন।" প্যারীর লোক যা বলে সবই 'কাজের কথা' আকেজো কোন কথা যেন তাদের অভিধানে নাই। খাবার বেলা শুধু কেঁকড়া-সিদ্ধ আর ধেনো মদ, কথার বেলা রাজা

মহারাজার মত। কাজে এবং কথায় অবহেলা লেগেই আছে, যেন দুনিয়াটা কিছুই নয়। ফরাসী মুদ্রা যেন ইচ্ছা হলেই পাওয়া যায়। এই রকমের মতিগতি হয় তখন, যখন ধনতন্ত্রবাদের দৌরাত্ম্য চরমে উঠে এবং অবাস্তব আত্মসম্মান ঘাড়ে চাপে। (ভিক্ষা করে খাওয়া হয় অথচ দেখানো হয় যেন কত ধনদৌলতের মালিক।) এর পর লোকটি বললে—সে পৃথিবীটা ওলট পালট করে দেখে এসেছে এবং বর্ত্তমানে ডেরা নিয়েছে প্যারীতে। লণ্ডন কিম্বা নিউইয়র্ক তার কাছে মোটেই ভাল লাগে না। ভাল না লাগবার প্রথম কারণ হল, ইংলিশ ভাষায় 'ব্যাকরণ' বল্‌তে যা বুঝায় তা নেই, আছে শুধু ফরাসী ভাষায়। সুইডেনের লোক ভুলেও ইংলিশ শিখে না এবং সেজন্যই সে লণ্ডনও পছন্দ করে না। লণ্ডনের মদ তার কাছে জলের মত, আর ফরাসীদের ভিনো-মদ অমৃত তুল্য। তার বলার বিষয় ছিল, যদি পৃথিবীতে কোথাও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য থাকে তবে আছে সুইডেনে। আমি যেন তাদের দেশে যাই।' অবসর না দিয়ে তাকে বল্‌লাম, "পৃথিবীতে যদি কোনও ইমারতী সৌন্দর্য্য থাকে তবে আছে শুধু ইণ্ডিয়াতে, সে যেন আমাদের দেশটা একবার দেখে আসে। লোকটা বাহাদুরী না করতে পেরে বললে, 'আর যাই কর না কেন প্যারীতে অন্তত তিন মাস না থাকলে কিছুই দেখতে পাবে না। সুযোগ পেয়ে বল্‌লাম চল ভাই আমার সংগে, রথও দেখা হবে কলাও বেচা হবে। ঐ যে দেখছ বড় বড় বাড়ি, নিশ্চয়ই তাতে ধনীরা থাকে, তাদের কাছে পোষ্টকার্ডও বেচা হবে আর সংবাদও সংগ্রহ করা হবে। তোমার খাই-খরচ এবং হাত-খরচ বাবদ আমি তোমাকে কিছু দেব।' লোকটা আমার কথায় রাজি হল এবং সেদিন বিকালেই আমার সংগে পোষ্টকার্ড বিক্রি করতে বের হল।

লোকটা বড়ই রসিক। সর্বপ্রথমই সে আমাকে ফ্রান্সের পুরাতন

সম্রাটদের প্রাসাদে নিয়ে গেল। নেপোলিয়নের কবর, তাঁর বাড়ি এসব দেখিয়ে বললে—"কি রকম সুন্দর প্রাসাদ! এমন প্রাসাদ ইণ্ডিয়াতে আছে কি অনেক ভারতবাসীকে এসব দেখিয়েছি, তারা হাঁ করে দেখে, সেই রকমে তুমিও বস এবং দেখ এমন সুন্দর প্রাসাদ আর কখনও দেখতে পাবে না।" কোন রকম মন্তব্য না করে তাকে বল্লাম, রাত্রে এক সংগেই আমরা খাব, সংগে চলার জন্য তোমাকে কত দিতে হবে? লোকটি হেসে বল্লে "বাহাত্তর ফ্রাংক।" বাঃ! বেশ সুন্দর কথা বলেছ, বাহাত্তর সেন্তিমও দেব না। যতগুলি বিল্ডিং দেখালে তাদের একটাতেও সিমেণ্ট ব্যবহার করা হয় নি, হয় পাথরের গুঁড়োর নয় ইটের চুণের প্লাষ্টার লাগানো রয়েছে। এসব "বর্বর" যুগের বিল্ডিং দেখে কি লাভ হবে? উদীপরা যে কয়'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে তাদের সকলের পকেট খুঁজলেও বাহাত্তর ফ্রাংক বের হবে না। আমি বলছিলাম বর্তমান যুগের বড় বড় বাড়িতে যেতে হবে। এই রকমের বাড়িতে প্রবেশ করতেও ভয় করে, এখানে সেন্‌টিপিড (চেলা) থাকবার খুবই সম্ভাবনা। উপরন্তু প্রত্যেকটা বাড়িই ঘামছে, প্রবেশ করলেই মনে হয় যেন কাঁদছে।"

লোকটি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের দেশে এ রকম বিল্ডিং আছে?

জোর গলায় বললাম, "নিশ্চয়ই আছে; পুরাতন দেখতে পছন্দ করি না। মহারাজাদের বাড়িতে গরীব মানুষের প্রতি অকারণে কত অত্যাচার হ'ত গরীব মানুষেরা মাথা পেতে সে সব সহ্য করত। এই ত আমাদের সামনে এত বড় বিল্ডিং, এখানেই নেপোলিয়েন থাকতেন। তাঁর মস্কো অভিযানে কত ফরাসী প্রাণ দিয়েছিল সে বিষয়টা তুমি নিশ্চয়ই জান। এই প্রাসাদের পরিচয় পুস্তকের মধ্যেই হওয়া ভাল, রাজপ্রাসাদ দেখে শরীরের রক্ত জল করার কোন মানে হয় না।

ফরাসীরা নিশ্চয়ই আমার মত পোষণ করে, নইলে লোক রাজপ্রাসাদ দেখতে আসে না কেন? এখানে যদি সকলেই আসত তাহলে বসবার জায়গাও খাবারের রেঁস্তোরা থাকত। এখানে কিছুই নেই, শুধু বিল্ডিং-গুলি সাধারণ লোককে রক্তচক্ষু দেখাচ্ছে, সেজন্যই এখানে কেউ আসেনা। আজ আমরা দু জন দর্শক মাত্র। এখান থেকে চল—আমরা মানুষ, মানুষের কাছে যাই। প্রাসাদ মানুষ গড়েছে, কিন্তু গড়েছে অনিচ্ছা সত্বে। জাঁকালো বাড়ি তৈরী করতে মজুরদের মজুরী দেওয়া হয়েছিল কি না কে জানে?"

আমরা ঐতিহাসিক বিল্ডিং দেখা শেষ করেছিলাম রাত নটারও পরে। উপর নীচ করতে অনেক পরিশ্রম হয়েছিল। ট্রামে করে কাছেই একটি বড় রেস্তোঁরাঁতে খেয়ে শত খানেক পোষ্টকার্ড সেই রেঁাস্তায়াতের বিলি করে দেখতে গেলাম কেউ কিছু দিয়েছে কি না—এদের দারিদ্র দেখে অবাক হতে হয়েছিল। প্যারীর সাধারণ লোক নিতান্ত গরীব। রেস্তাঁরা থেকে একটি ফ্রাংকও পাই নি। সুইডেনের লোককে পাচ ফ্রাংক দেখিয়ে বললাম "তেমাকে দেবার কথা ছিল বাহত্তর ফ্রাংক, কিন্তু পাঁচ ফ্রাংকও পাওয়া গেল না, কি রকম রেস্তোঁরা?

সে বললে, "এটা বেকারদের রেস্তোরা, এরা কি করে দান করবে? চল অন্য কোথাও যাই। অন্য জায়গায় যেতে হলে রুমে ফেরা যাবে না তাও বলে দিচ্ছি।"

'সেলভে দু সেলুই' আমার পৈত্রিক ভিটা নয়; কোথাও ঘুমাতে পারলেই হবে।" আমরা বেকারদের আড্ডা ত্যাগ করে একটি ভাল রেস্তোঁরায় গেলাম যেখানে কাজকর্মে নিযুক্ত লোকরা খেতে যায়।

সেখানেও আমরা খেয়েছিলাম এবং পঁচিশ ফ্রাংকের মত ভিক্ষা পেয়েছিলাম। তারপর শোবার ঘরের জন্য যেতে হয়েছিল।

কলিকাতার বস্তির গলিপথ যাঁরা দেখেছেন—তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই সহরের বস্তির রাস্তা কতখানি চওড়া। প্যারীতে সেই রকমেরই একটি গলি পথ দিয়ে চলছিলাম। পথে গ্যাসের আলো জ্বলছিল। কলিকাতার বস্তির গলি পথের দুদিকে টালির ছাওয়া এক তলা ঘর থাকে। প্যারীর গলিপথে ফুটপাত থাকে না। সেখানে দু দিকে দু তলা তিন তলা বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বাড়িগুলি সাধারণত অনেক পুরানো এবং গলি রাস্তায় চলতে স্যাঁতসেঁতে বাতাসের গন্ধ পাওয়া যায়। উপরন্তু জনমানব আছে বলে মনে হয় না।

একটি বাড়ির কড়া নাড়তেই একজন মহিলা দরজা খুলে দিয়ে সুইডিশ লোকটাকে দেখা মাত্র জিজ্ঞাসা করলেন, "হালো জ্যান্! কি মনে করে? ভেতরে এস।" জ্যান্ লোকটি কে—বুঝতে পারছিলাম না, বেশ ইংলিশ বলছিল অথচ ইংলিশ ভাষার প্রতি তাঁর বিরক্তির ভাব সব সময়েই ছিল।

চলতে চলতেই সে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল "দু'খানা রুম পাওয়া যাবে? উত্তরে ভদ্রমহিলা বললেন, "দুখানা কেন দশ খানাও পেতে পার, কিন্তু জ্যান্ ভাড়া নগদ দিতে হবে।"

"সেজন্য ভেব না মেম, আগেকার পাওনাও তোমাকে দিতে যেতে পারব। আগামী কালও এখানে থাকব, সংগের লোকটি বেশ ভাল, সকলেই তাঁকে সাহায্য করছে।" ইতিমধ্যে আমরা বসবার ঘরে পৌছলাম। বিজলী-বাতির সুইচ্ টেপা মাত্র ঘরটা আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঘরটাতে খান কয়েক চেয়ার ও একটা গোল টেবিল ছিল। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মহিলা ছাড়া বোধ হয় আর কেউ ঘরে

ছিল না। প্রথমেই জ্যান্ বললে, 'খাওয়া হয় নি, আমাদের খেতে হবে। মাহিলা আমাদের বসিয়ে রেখেই দু খানা রুম তৈরী করে এলেন। সেই সংগে দুই কাপ কাফি। ছোট কাপের দুই কাপ কাফি খেতে একটুও কষ্ট হচ্ছিল না কিন্তু জ্যান্ কি করে খাবে তাই ভাবছিলাম। আমাদের দেশের লোক না খেয়ে পথ চলে, ফরাসীরা যেমন খেতে জানে তেমনি আরামও করতে জানে, অথচ আমরা গিয়েছিলাম একটি বস্তিতে। প্যারীর বস্তি এবং কলিকাতার বস্তিতে কত প্রভেদ কলিকাতার লোককে বুঝানো কঠিন। ফরাসীদের সভ্যতা জ্ঞান আছে, আমাদের নাই, ফরাসীদের নৈতিক চরিত্র আছে, আমাদের তা নাই। আমাদের বস্তিতে যারা ঘর করে বাস করে তারা উত্তর প্রদেশের মজুর শ্রেণীর লোক। আদেশ মান্য করাই ছিল তাদের এক মাত্র অধিকার। তাদের বাড়িঘর দেখে ফরাসীদের বস্তির তুলনা করা অন্যায় হবে নিশ্চয়ই।

ফরাসীদের গোলাবাড়ী আর আমাদের গ্রামে আকাশ পাতাল তফাৎ। বারবার সেই দৃশ্য দেখিয়েছি। আমাদের গ্রাম এখনও প্রিমিটিভ্ যুগেই রয়েছে, পরিবর্তন হয় নি ফরাসীদের গ্রামের পরিবর্তন এসেছিল বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে। আমাদের দেশে বিদ্রোহ হয়েছে, বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ রয়েছে, বিদ্রোহীদের মধ্যে গ্রামের লোক অংশ গ্রহণ করে নি। গ্রামের লোক যে অন্ধকারে ছিল সেই অন্ধকারেই রয়েছে। গ্রামের লোক যে পর্য্যন্ত বিদ্রোহে যোগ না দেবে, দেশব্যাপী যে পর্য্যন্ত বিদ্রোহ না হবে সে পর্য্যন্ত আমরা দশ হাজার বৎসর পূর্বে যেমন ছিলাম তেমনি থাকতে বাধ্য হব।

হাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম সন্ধ্যায় এবং বিকালে কলিকাতার ভদ্র-পল্লীতে ধুঁয়ায় মানুষকে যেমন কানা ক'রে দেয়, প্যারীর বস্তিতে গ্যাসের উনুন প্রচলন থাকায় সে রকম কিছুই দেখতে প্যাওয়া যায় না। শুধু তাই

নয়, আমাদের দেশে ভদ্রপল্লীর শিশুরা স্বাধীনতা পাবার পর পল্লীপথে যে রকম বেপরোয়াভাবে চলে, প্যারীর বস্তিতে শিশুরা সেই রকম ভাবে চলে না। ছোট বেলা থেকেই তাদের সহরে থাকার উপযুক্ত ক'রে তোলা হয়।

এক ঘণ্টার মধ্যেই রান্না হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দৈনিক টেলিগ্রাফ পড়া হয়েছিল। খেয়েছিলাম স্যুপ, আলুসিদ্ধ, প্রচুর মাখন, মাংস এবং কফি গিদ্ধ। সকলেই পেট ভরে খেলাম, তারপর চল্‌ল নানারকম গল্প 'আগতপ্রায় যুদ্ধ কেমন হবে? আবার প্যারীর পতন হবে কি না? হিট্‌লার যুদ্ধের দিকে কতটুকু অগ্রসর হয়েছেন' ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, এই এলাকাতে অনেক বিদেশী দরিদ্র বাস করে। মেয়্কে দেখে এবং খাদ্য খেয়ে মনে হচ্ছিল না—এদিকের লোক অর্থাভাবে কষ্ট পাচ্ছে। হাঁ, তবে এদিকের লোক উচ্ছৃঙ্খল নয়, কিম্বা মাতালও নয়। এই অঞ্চলে মদের প্রচলন খুবই কম। শোবার বিছানা দেখে ভাবলাম মাত্র পাঁচ ফ্রাংকে কি ক'রে এমন সুন্দর বিছানা দিতে পারে? বাস্তবিকই এই এলাকাটা যেন প্যারীর বাইরে।

পরের দিন সকালে ঘরেতে কিছুই খেতে পাওয়া যায় নি। মহিলা সকালে নানা কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সকালের দিকে সকলেই বাইরে কিনে খায়, পারলে দুপুরেও খেয়ে আসে। ইংলণ্ডের মত ব্রেড্ এণ্ড ব্রেকফাষ্টর পরিবর্তে ডিনার এবং বেডের প্রচলন বেশি। অনেকে সকাল ন'টা দশটা পর্য্যন্ত বিছানাই ত্যাগ করে না। আমার মনে হয় এই মহিলাও তখন বিছানাতেই ছিলেন। জ্যান্ মুখরক্ষা করবার জন্য আমাকে বলেছিল, মহিলা এখন বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছেন।'. আমরাও ছোট একটি রেঁস্তোরাতে ত্রিশ সেন্‌তিম ক'রে কাফি, তিন বেনতিম ক'রে ডিম খেয়ে

সুখী হয়েছিলাম। এটা হল ১৯৩৫-৩৬ সালের প্যারীর খাদ্যদ্রব্যের দর বর্ত্তমান দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ নাই।

লজিং হাউসে ফিরে আসবার সময় কতকগুলো খবরের কাগজ এনেছিলাম। সেগুলোর পড়া শেষ করতে বেলা হয়েছিল একটা। তখনও বের হবার সময় হয় নি। জ্যান্ তখনও ঘুমাচ্ছিল। বেলা তিনটার সময় ক্ষুধায় কাতর হয়ে আমি জ্যান্‌কে ডাকতেই সে উঠল এবং তাড়াতাড়ি ক'রে কাছেই একটি রেঁস্তোরাতে কিছু খেয়ে নিয়ে চল্‌ল ধনীদের পাড়ায়।

দেখবার মতই বাড়িগুলি এবং সেখানে যারা বাস করে প্রকৃতই তারা ধনী, কিন্তু কোনও ধনীই আমাদের আপ্যায়ন করে নি। আমরা ধনীদের অধ্যুষিত রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করলাম এবং একটি আরাম দায়ক সিটে বসলাম। বয়, 'কি চাই জিজ্ঞাসা করলে। জ্যান্ তাকে ফরাসী খাদ্যের ফরমাস দিল। জনের কাছে বয় চুপি চুপি কি বল্‌লে। জ্যান্ মাথা নাড়ল। কতক্ষণ পরে পকেট থেকে পঁচাত্তর খানা পোষ্টকার্ড বয়ের হাতে দিলাম। খানিক বাদেই আমাদের টেবিলের কাছে কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন এবং একটি লম্বা টেবিলের এক কোণে আমাকে বসিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন পত্র আমার হাতে দিলেন। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দেবার পর জিজ্ঞাসা করলাম—আর কারো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে কি না? কারো জিজ্ঞাসা করার কিছুই ছিল না শুধু একজন ভদ্রলোক তাঁর নূতন প্রশ্নে জিজ্ঞাসা করলেন 'ইণ্ডিয়ার লোক কি তাদের বর্ত্তমান অবস্থাতে (ইংরেজ রাজত্ব) সন্তুষ্ট?' এর উত্তরে যা বলছিলাম শুনে সেই ভদ্রলোক কুড়ি ফ্রাংক-এর এক খানা নোট দিয়েছিলেন। এখানে 'কুড়ি ফ্রাংক প্রত্যাখ্যানের প্রশ্ন আসেনা, প্রশ্ন আসে নিজের দেশের সঠিক সংবাদ বলতে যে আপমার হয় তারই যন্ত্রণা

সহ্য করতে পারছিলাম না। স্বাধীনতা পাবার প্রশ্নই ছিল তখনকার দিনের বড় প্রশ্ন, কিন্তু আমাদের 'কৃষ্টি' ত বৃটিশ ধ্বংস করছিল না। বরং রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং অন্যান্য মহাত্মাদের এ বিষয়ে সাহায্যই করেছিল। আজও আমরা সতী দাহের প্রশংসাই করি আজও রামরা গঙ্গাসাগরে শিশুসন্তান নিক্ষেপ করাকে পুণ্যকার্য্য বলেই মনে করি, আর বিধবা বিবাহ অসবর্ণ বিবাহ এখনও আমাদের সমাজে প্রচলন হয় নি। জাতিভেদ বা কাষ্ট-সিষ্টেমের ছাঁচ আমাদের গা সহা হয়ে গেছে। যে ছুঁৎমার্গের কুপ্রথাকে স্বামী বিবেকানন্দ বার বার কঠোর ভাবে নিন্দা ক'রে গেছেন, এখনও বাংলার গ্রামে সেই ছুঁৎমার্গের ক্যাসিবাদ সাধারণ লোকে মহানন্দে মান্য ক'রে চলে। আমাদের সমাজে যে সব ভ্রান্ত প্রথা' নিষ্ঠুর নিয়ম, জঘন্য আচার ও রাশিরাশি কুসংস্কার এখনও আছে তা হাজার চেষ্টা করলেও বিদেশী পর্য্যটকদের তীক্ষ্ণ নজর এড়াতে পারে না। কিন্তু সমাজের গ্লানি ও জঞ্জাল দূর করবার জন্য আমারা এখনও সেরূপ সংগঠিত আন্দোলন করতে সক্ষম হই নি। এই কথা সকল স্থানে সকলের কাছে গোপন করা চলে না। বাধ্য হয়ে আমাকে প্রশ্নকারীর সব কথাগুলি স্বীকার করতে হয়েছিল। এতে মনে আঘাত লেগেছিল, ভুক্তভোগী ছাড়া অন্য কারো বুঝাবার ক্ষমতা নাই বিদেশে যেয়ে স্বদেশের দুর্ভাগ্যের কথা বড় বলা কত অপমান।

এখানে একটি ছেলের কথা না ব'লে পারলাম না। ছেলেটি জাতে ডাচ্ নিদারলেণ্ডের বাসিন্দা। তার সংগে তাদের দেশেই দেখা হয়েছিল। আমার সাহায্য পেয়ে সে প্যারীতে এসেছিল। তার সঙ্গে কথা ছিল সেল্ভেসন আর্মির বাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। সেল্ভেসন আর্মির বাড়িতে সে প্রায়ই আসত এবং খোজ করে যেত। সে এসেছিল গাড়িতে করে, আমি এসেছিলাম সাইকেলে করে সেজন্য পৌছার সময়ের

নিশ্চয়তা ছিল না। প্যারী হতে বিদায় নেবার সপ্তাহ পূর্বে তার সংগে দেখা হল। সে আমাকে টেনে নিয়ে চল্ল একটি আড্ডা বাড়িতে, সেখানেই সে থাকত।

প্রশস্থ পথের উপর ছয় তলা বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে বিভিন্ন রকমের সাইন বোর্ড। একটি সাইন বোর্ড আমার মনাকর্ষণ করল। সাইন বোর্ড রুশ ভাষায় লিখা ছিল, নিচে ছিল ফরাসী ভাষায় লিখা। কন্‌সাল সারভিস কথাটা ভাল করেই বুঝলাম। ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলাম "এটা কি রকমের কন্‌সাল সারভিস্ হে, সোভিয়েট রুশিয়ার পতাকা ঝুলছে না কেন?

ছেলেটি বললে" এটা সোভিয়েট রুশিয়ার কন্‌সাল অফিস নয়, জারের আমলের কন্‌সাল সারভিস, এখান থেকে এন্টি সোভিয়েট প্রপেগেণ্ডা হয়, আমিও তাদের দলে আছি। আর কিছু না হ'ক খেতে পাচ্ছি ত?

ছেলেটিকে কিছুই বল্লাম না শুধু আফিস এবং কয়েকজন লোকের দেখা সাক্ষাৎ পাব ভরসা করে উপরে উঠলাম। তিন তলার সামনে একটি রুমে কনসাল আফিস। আমাকে দেখা মাত্র একজন লোক কাউণ্টারের ভেতব থেকে বেরিয়ে এসে ফরাসী ভাষায় কি বললে। ইংলিশে বল্লাম "ফরাসী ভাষা জানি না।"

লোকটি ইংলিশে বললে "ভিসা নিতে এসেছেন কি? রুশ দেশে আপনি যাবেন?"

রুশ দেশে যাই না যাই সে অন্য কথা, আপনারা কে হন্? আপনারা কি সোভিয়েট রুশিয়ার কন্‌সাল?

লোকটি আমতা আমতা করে কাউণ্টারের মধ্যে চলে গিয়ে বল্লে "আমরাও ভিসা দিতে পারি।"

রুশ দেশে আমি যাব না, সাইকেলে ভ্রমণ করার মত ভাল পথও নাই উপরন্তু শীত এসে গেছে, এখন রুশিয়াতে সাইকেলে কেন মোটর কারেও যাওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা হল আপনারা এমন একটি কন্‌সাল সারভিস খুলেছেন যা আমার মতে জাল ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ছেলেটিকে কি করে আপনারা পেলেন ?"

কাউণ্টারে বসা লোকটা আর কথা না বলে ভেতরে চলে গেল, বুঝলাম সে আর কথা বলতে রাজি নয়। এখানে অনেক বিদেশীকে ঠকানো হয়। অনেকে মনে করে এটাই সত্যিকারের কন্‌সাল আফিস। উপযুক্ত ফি দিয়ে ভিসা নিয়ে যখন রুশ সীমান্তে পৌছে তখন নকলে ভিসা অগ্রাহ্য হয় এবং পর্য্যটনকারী আপনা হতেই সোভিয়েট রুশিয়ার উপর বিরক্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্য্যন্ত এই প্রকারের জাল ভিসা প্রদানকারীদের আফিস ছিল, এখন তাদের কি অবস্থা এবং ব্যবস্থা হয়েছে সে সংবাদ আমি রাখি না। ছেলেটি কিন্তু আমার সংগে বেরিয়ে এল না! সেখানেই রয়ে গিয়েছিল। বুঝতে পেরেছিলাম অপাত্রে দান করেছিলাম। তবুও মন্দের ভাল কিছুই সংবাদ পাওয়া গেছে। পৃথিবীর বড় বড় সহরে, ধনতান্ত্রিক দেশের কথাই বলছি, সর্বত্রই দেখা যায়, জালিয়াৎ, জোয়াচ্চোর এবং আরও অনেক রকমের সমাজদ্রোহীদের দল গ‍ে উঠছে ক্রমেই। এদের মন্দ বলাও চলে না। চাকরি যোগাড় করতে জুতোর সুখতলী ক্ষয় হয়ে যায় তবুও চাকরি মেলে না, সৎ উপায়ে থাকতে হলে যে সুযোগ সুবিধার দরকার তা পাওয়া যায় না। মানুষ ইচ্ছা করে অন্যায় কাজ করতে রাজি হয় না তা আমি জানি এবং সেজন্যই ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলির পাপীদের বিরুদ্ধে কিছু বলতে ইচ্ছা হয় না।

প্যারী নগরের নাম যাই হউক তার উচ্চারণ হয় অনেক রকমে যেমন

পেরী, প্যারী, পেরিস্। বৃটিশরা সাধারণতই পেরীস্ বলে। উচ্চারণটা হয় একটু গরম সুরে। ইউরোপের সর্বত্র "পেরী" ই উচ্চারিত হয়। শব্দ উচ্চারণ করতে ফরাসীরা যেমন শক্তি ব্যবহার করতে রাজি নয়, অন্যান্য ইউরোপীয়ান জাতও ঠিক সেরূপই শব্দ উচ্চারণ করতে মুখ বিকৃত করতে প্রস্তুত নয়। আমরা কেন যে আপ্রাণ চেষ্টা করেও শব্দের বিকৃত উচ্চারণ করি তার বিশেষ কারণ আছে।

প্রকৃতপক্ষে প্যারী একটি ইন্টারনেশনেল নগর। এখানে না আছে এমন জাতের লোক নাই, লণ্ডন, বার্লিন এবং ইউরোপের অন্যান্য সহরে পৃথিবীর সমগ্রজাতের লোক বেশি করে বাস করে না এখানে উল্টো, এটাই হল প্যারীর বিশেষত্ব। বর্ণবৈষম্য নাই, রাজনীতির বাক্য স্বাধীনতা রয়েছে, হাতে অর্থ থাকলেই হল। লণ্ডন, বারমিংহাম প্রভৃতি সহরে পার্কে বাক্য স্বাধীনতা আছে কিন্তু যেখানে বৃটিশ জাত বেশি সেখানে বাইরের লোকের পক্ষে সংযত হয়ে কথা বলতে হয়। ফরাসীদেশের সর্বত্র বাক্য স্বাধীনতা রয়েছে। যা ইচ্ছা বলে যাও, ফরাসী জাতকে মিনিটে মিনিটে নরকে পাঠাও ফরাসীরা শুধু হাসবে, কিছুই বলবে না।

লণ্ডনে গিয়ে দেখেছিলাম বৃটিশের রাজভক্তি যেমন অটুট, রাজার প্রতি যেমন শ্রদ্ধা এবং ভক্তি রয়েছে ফরাসীদের ঠিক সেরূপ করে শ্রদ্ধা ভক্তি রয়েছে বর্ণবৈষম্য অহবেলাকরা, রাজার প্রতি ঘৃণা করা, বাক্য স্বাধীনতা বজায় রাখা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা সর্বদিক দিয়ে মেনে নেওয়া। বৃটিশের বিপরীত দিকটা দেখাএবং অনুভব করার স্থান হ'ল ফ্রান্স। এমন দেশে ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, কিন্তু উপায় নাই অন্য দেশে যেতে হবেই।

প্যারী নগরের অনেক' কিছু দেখেছিলাম তার সবটা এখন মনেও নাই, যতটুকু মনে আছে এবং ডাইরীতে নোট করেছিলাম তার সবটাই

বলা হয়েছে, তবুও মনে হচ্ছে কিছুই যেন বলতে পারি নি। নোট বই এর পাতায় দেখলাম আর আর একটি দিকের কথা মোটেই বলা হয় নি। অনেকের হয়ত মনে জাগতে পারে—'সে আবার কোন দিক? সে দিক পূর্বও নয় পশ্চিমও নয়, সেটা হল মানব চরিত্রের গতি—যার সবটাই নির্ভর করে আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর। আর্থিক দুর্গতির সুযোগ নিয়ে যারা মানুষকে বিপথগামী করে, সেই সব দুর্বৃত্তদের আমিএকটুও মন্দ বলিনা। আমি বলি যারা আর্থিক দৈন্যতা আনে তারাই সমাজের শত্রু। 'সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার' স্লোগান প্রচারকারী সাম্রাজ্যবাদী ফ্রান্সে আর্থিক পরাধীনতা তত ভয়াবহ বলে মনে হচ্ছিল না, আমার মনে হচ্ছিল বৃটিশ প্রপেগেণ্ডার ফলেই ফরাসীদের এত বদনাম হয়েছিল।

চীন দেশে ভ্রমণ করায় সময় দেখেছিলাম, যে কোন অন্যায়কারীকে লোকে 'কোণ্টনিজ' (কোণ্টনের অধিবাসী) ব'লে মিথ্যা পরিচয় দেয়। ইউরোপেরও সেই নিয়ম। ইউরোপে যে কোন শ্বেতাঙ্গ ব্যভিচারী, আফিংখোর, কোকেন্-ব্যবসায়ী হলেই সে 'ফ্রেঞ্চমেন' ছাড়া আর কেউ নয়! 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'—এই প্রচলিত বাক্যটিই ফরাসীদের উপরে আরোপ করা হয়ে থাকে। বৃটিশ নানা ভাবে ফরাসীদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে অনেক মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে বেড়াত সেজন্য সারা দুনিয়ায় ফরাসীদের সম্বন্ধে লোকের অযথা ভ্রান্তধারণার উৎপত্তি হয়েছে। যতটা দোষ ফরাসীদের জাতীয় চরিত্রে ইংরেজ ও অন্যসব ইউরোপীয়ান্ জাতি মিথ্যা কাহিনীর সৃষ্টি করে চাপিয়েছে—আসলে ফরাসীদের চরিত্রের মধ্যে সেরূপ দোষ ষোলভাগের একভাগ হয় ত আছে। বাকী সবই অন্যদের কল্পিত। অপরকে অবজ্ঞার পাত্র সবাই দেখতে চায় কিন্তু নিজের মধ্যে যে কত গলদ ও দোষত্রুটি আছে, সে দিকে কোন লোক বা কোন জাতি কখনও চেয়ে দেখে না, এইটেই হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদী দেশের স্বভাবগত একটি অদ্ভুত রীতি ও অভ্যাস।

ধবতন্ত্রবাদই সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তির কারণ। ফরাসী দেশের ধনিক পুঁজিপতিরা তাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ চালু করার দিক দিয়ে জনসাধারণকে অজ্ঞাতে অন্ধ ক'রে রাখার বিভিন্ন কুপদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। ইউরোপের গ্রেটবৃটেন এবং আয়র্রলেণ্ড ছাড়া সর্বত্রই ফরাসী ভাষা দুভাষীর কাজ ক'রে যাচ্ছে। তুর্কী, আরব, পারস্ত এমন কি আফগানিস্থানের 'বিদেশী ভাষা' ফরাসী ভাষা। এই ভাষার ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখার জন্য ফরাসীরা অকাতরে সব কিছু দিতে প্রস্তত। আফ্রিকার বৃটিশ কলোনী ছাড়া প্রায় সর্বত্র ফরাসী ভাষার প্রচলন রয়েছে। যখনই ফরাসী মজুর কোন রকম বিদ্রোহ করে, অমনি ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের দোহাই দেওয়া হয়। অনেক সময় সেই দোহাই কার্য্যকারী হয়। ক্ষুধার্ত শোষিত মজুররা ভাষা-সাম্রাজ্যবাদের মোহে মৃত্যু বরণ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ফরাসীদের এই ভাষা-সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস করেছে। সিরিয়া এখন স্বাধীন দেশ হয়েছে। দেশে দেশে মাতৃভাষার আদর বেড়ে চলেছে। সকল রকমের সাম্রাজ্যবাদ আজ 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ছে। সারা দুনিয়ার সাম্রাজ্যবাদের ত্রাণকর্ত্তা আজ আর কেউ নেই। বৃটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ, ডাচ এবং আমেরিকান্ সাম্রাজ্যবাদীদের একই সংগে মৃত্যু হবে। ফরাসী দেশের মজুর এবং কৃষক আজ জেগেছে, তারা পেট ভ'রে খেতে চায়, আলো-বাতাসওয়ালা ও স্বাস্থ্যকর ভাল ঘরে থাকতে চায়। তারা চায় না, তাদের ভাষা ব্যবহার করে অন্য জাত সভ্য হোক, আফ্রিকাতে নিগ্রো অথবা ইন্দোচীনে আনামিতরা ফরাসী ভাষা আয়ত্ত ক'রে নিজেদের 'ফ্রেঞ্চম্যান' বলুক।

আজ আমেরিকাতে নিগ্রোভীতি যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ফরাসী দেশে পূর্বে কখনো সেই রকম নিগ্রোভীতি কিম্বা বর্ণবৈষম্য ছিল না। সেজন্যে ফরাসীরা পূর্বেও পৃথিবীর লোকের কাছে আদরণীয় ছিল

এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্যবাদী ছিল এবং আছে তাদের মধ্যে ফরাসীরাই বর্ণবৈষম্য প্রশ্রয় দেয় নি, এটা নিশ্চয়ই বড় কথা। যারা বর্ণ বৈষম্যের পদাঘাতে জর্জ্জরিত, তারা একদিকে ফরাসীদের যেমন প্রশংসা করবে, অন্য দিকে ফরাসীদের সাম্রাজ্যবিস্তারের লোভকে ঘৃণার চক্ষে দেখবে। সকল রকমের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবেই, তবে হচ্ছে না কেন সে-কথা সংক্ষেপে পূর্বেই বলা হয়েছে।

ফ্রান্স হ'তে বিদায়।

যে দেশের নাম শুনলে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোক মোহিত হয় সেই দেশ হতে বিদায় নেবার সময় এসেছিল। প্যারীতে আর ফিরে যাব সে ধারণা ছিল না। গতর খাটিয়ে ভ্রমণ বার বার হতে পারে না। বিদায়ের দিন কুসুম পালের সংগে সাক্ষাৎ করে বলেছিলাম "ফরাসী দেশে আবার আসা আমার পক্ষে অসম্ভব। সম্পত্তির মধ্যে এক মাত্র সম্পত্তি হ'ল শরীর, তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।"

কুসুম পাল বলছিলেন "এটা হল খাটি সর্বহারার কথা।"

সর্বহারা ছিলাম কি আর কিছু ছিলাম তখনো হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি। এবার বুঝতে পেরেছি আমার অবস্থা কি?

একটি বিশিষ্ট স্থান ত্যাগ করতে বাস্তবিকই দুঃখ হচ্ছিল। বড় বড় বিল্ডিং, ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ স্থানে যেতে একটুও ইচ্ছা হচ্ছিল না। শুধু মানুষ দেখতাম এবং ভাবতাম "এই ত ফরাসী জাত, এদের কত প্রতাপ। ইন্দোচীনে, মাদাগাস্‌কারে এরাই দৈরাত্য করছে অথচ ফ্রন্সের সাধারণ লোক তাদের কলোনীতে কি হচ্ছে একটুও দৃষ্টি রাখছে না। যাদের এতগুলি উপনিবেশ তাদের রাষ্ট্রকেন্দ্র দেখলে মনে হয় যেন একটি শয়তানের খেলার মাঠে এসেছি। সাধারণ লোক তাদের দেশের অনুপাতে নিতান্ত দরিদ্র। সামান্য মুদ্রার পরিবর্তে যখন তখন মত পরিবর্তন করে। এটা কি কম দুঃখের কথা অথচ এই সহরেই এমন বিদ্রোহ হয়েছে যার প্রভাবে এখনও অন্যান্য দেশের লোক তাদের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করে। এই ধরণের চিন্তাধারা প্রায়ই হ'ত, কিন্তু কারো

কাছে কিছুই বলতাম না এমন কি কুসুম পালের কাছে বলি নি। তিনি ছিলেন ভাগ্য এবং বিধাতার অনুগ্রহ প্রার্থী, আমি ছিলাম তার বিপরীত মতাবলম্বি।

নির্দ্ধরিত দিনর সকাল বেলা প্যারী হতে রওয়ানা হলাম। ঘণ্টায় চার মাইল চলতেও কষ্ট হচ্ছিল। চলতে কষ্ট হবে না কেন? শরীর ত মেসিন নয়। মনের শক্তি এখানে ফেল মেরে যাচ্ছিল। পথে দেখা হ'ল কয়েকটি বৃটন যুবকের সংগে তারা যাবে ডেপী। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা দাঁড়াল এবং থামিয়ে জিজ্ঞাসা করল "কোথায় যাবেন স্যার?"

ব্যবহার অতীত ভদ্র। ডেপী যাব যখন শুনল তখন তারা বলল এদিকে আসুন আমরা রেল স্টেশনে যাচ্ছি।

সাইকেলে ডেপী যাব ঠিক করেছি বন্ধুগণ।

রেখেদেন সাইকেল, আকাশের দিকে চেয়ে দেখুন হয় ত আর দু দিন তারপরই আরম্ভ হবে ঝড় তুফান। তখন আপনি পথ চলবেন কি করে?

সাইকেলে আর উঠলাম না, যুবকদের বল্লাম "চল কোন দিকে যাবে।"

পথ দেখিয়ে তারা চল্ল। স্টেশনে যেয়ে দেখলাম বিরাট স্টেশন, এখান থেকে গাড়ি যায় সোজা ডেপী পর্য্যন্ত। যুবকেরা বললে সেদিন তারা রওয়ানা হবে না, হয় ত একদিন থেকে ভাড়ার টাকা যোগার করে গাড়িতে বসবে। আমার অভাব ছিল না, ইচ্ছা হল দেখতে, কি করে এরা ভাড়া যোগাড় করে।

আমাকে নিয়ে একটি লজিং হাউসে গেল। সেখানে সারি বাধা বিছানা। দু ফ্রাং করে ভাড়া। সকলেই নগদ মূল্য দিয়ে বিছানার টিকিট কিনল। আমিও কিনলাম। প্রত্যেককে একটি করে সিন্দুক

দেখিয়ে দেওয়া হল। আমাদের যথাসর্বস্ব সিন্দুকে বন্ধ করে দিয়ে বাইরে চল্লাম। সাইকেল নিয়েই চলতে ভাল লাগছিল। পায়ে হাটতে মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। এরা চলছিল ফুট-পাথ দিয়ে, আমি চলছিলাম রাস্তা ধরে। দু দিকে সারি দিয়ে পুরাতন বিল্ডিং। অনেকটা ডালহৌসী স্কোয়ারের মত অফিস কোয়ার্টার। দল বেঁধে অফিসে প্রবেশ করছিল। ঘণ্টা দুই তারা অফিসে অফিসে গেল, তারপর ফিরে এসে বলল "আমাদের ভাড়ার টাকা যোগার হয়ে গেছে, আগামী কাল এখান থেকে রওয়ানা হব। আফিস গুলিতে যেয়ে কে কি বলছিল নীচ থেকে শুনবার অথবা দেখবার উপায় ছিল না। বুঝতে পেরেছিলাম এরা কায়দা মাফিক ভিক্ষা করেছিল। রাত্রে তাদের ভিক্ষা পদ্ধতি জেনেছিলাম তারপরর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকি। এক জন যুবক জিজ্ঞাসা করলে" একেবারে চুপ মেরে গেলেন যে ?

আমার ধারণা ছিল কোন বৃটন্ বিদেশে যেয়ে ভিক্ষা করে না, আমাদের দেশের ধনীর ছেলেরা তাই বলে এবং বেশ গর্ব করে।

আমার কথা শুনে যুবকদের মধ্যে একজন বললে "জানি না আপনাদের দেশে কি রকম লোক বাস করে, আমাদের ধারণা ইণ্ডিয়াতে শুধু রাজা মহারাজা, নবাব সুলতান এবং তাদের প্রজারা সবাই ধনী, এক বার ইণ্ডিয়াতে গেলে হয়, অন্তত ভিক্ষা করে লাখপতী হয়ে ঘরে ফেরা যাবে।

এ সম্বন্ধে আর কথা বাড়ালাম না। জানতাম ভারতীয় ধণিক-সম্প্রদায় নামে যারা পরিচিত, আত্মসম্মান বলতে তাদের কিছুই নাই। তারা হল শক্তের ভক্ত, নরকের যম।

ফ্রান্স কেন ইউরোপের সর্বত্রই দেখা যায় আত্মসম্মান বলতে কিছু যা বুঝায় ইউরোপীয়ানদের মধ্যে বেশ আছে। আত্মসম্মাণীরা

প্রানের মায়া করে না। আজও ফরাসী দেশে "ডুয়েল" আছে। ডুয়েল বলতে যা বুঝায় ইণ্ডিয়াতে কোন কালেই ছিল না। দুই জন প্রতিদ্বন্দ্বী। এক জনের মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত লড়াই করতে থাকে। যে নিহত হয় সে প্রাণ ভিক্ষা করে না অথবা পালিয়ে যায় না। যে জয়ী হয় সে বুক ফুলিয়ে হাটে না।

এতে সাধারণ লোক শিক্ষা পায়। সাধারণ লোক বুঝতে পারে বাজে কথা বল্‌লে তার ফল ডুয়েল। আমরা দশ জনে মিলে এক জনকে আঘাত করি, এই ত আমাদের সভ্যতা তার উপর যারা বিদেশে যেয়ে নিজের দেশের দারিদ্র এবং অশিক্ষিতের রক্ত শোষণকরে অর্থ নিয়ে বড় মানুষী করে তারা নিতান্ত অভদ্র এবং সংস্কৃতি বিহীন। স্বচক্ষে দেখেছি এক জন ভারতীয় রাজা শ্বেতকায়ের জুতোর উপর মাথা রেখে রোদন করতে, এই শ্রেণীর লোকের পক্ষেই নরমের উপর গরম হওয়া চলে। তারাই বলে বিদেশে যেয়ে শুধু নবাবী কর।

এসব কথাই ভাবছিলাম এবং দেখছিলাম বৃটন্ যুবকদের চাল-চলন। আমার কাছে তাদের চালচলন এবং কথা একটুও নূতন মনে হচ্ছিল না।

পরদিন রেল গাড়িতে উঠলাম দশটায় গাড়ি ছাড়ল। বৃষ্টি পড়তেছিল। আমি যে কম্‌পাট্‌মেণ্টে উঠেছিলাম সেই কমপাটমেণ্টে এক জন ফরাসী ও ছিলেন। মুহুর্ত্তের মধ্যে আমাদের পরিচয় হ'ল। আবহাওয়ার কথাই বেশি হচ্ছিল তারপর আমার ভ্রমণ কথা আরম্ভ হল। উত্তর ও মধ্য ফ্রান্সে কি দেখেছি তাই বল্‌লাম। এই পথটুকু কেন গাড়িতে যাচ্ছি সে কথা বল্‌লাম না। ফরাসী ভদ্রলোক নিজেই বললেন "আর বাই-সাইকেল চালানো সম্ভব হবে না, আপনি বোধ হয় লণ্ডনে শীত কাটাবেন ?

আমাদের কথা হচ্ছিল ইংলিশে। একটু দূরে অন্ত দুজন ইংলিশ

কি স্বচ ছিলেন জানি না। দুঃখ করে ফরাসী ভদ্রলোক বললেন "আপনি একটি ফরাসী শব্দ না শিখে কি করে কন্টিনেন্ট ভ্রমণ করলেন সেকথাই ভাবছি।

ভুল করলেন মঁসিয়ে, ইরাণ হতে ফরাসী ভাষার সাম্রাজ্য আরম্ভ হয়েছে, এবং শেষ হয়েছে এখানে ডেপীতে। এর মাঝে ফরাসী ভাষা মধ্যম ভাষার কাজ করে। এটাও তবে জেনে রাখুন কন্টিনেন্টে (ইউরোপ) যদিও মধ্যম ভাষার কাজ ফরাসী ভাষা করছে ভবিষ্যতে অন্য ভাষা ফরাসী ভাষার স্থান কেড়ে নেবে। আপনারা নূতন কিছুই দিতে পারছেন না, সেইজন্যই আপনাদের ভাষার প্রভাব কমে যচ্ছে।

ফরাসী ভদ্রলোক একেবারে চুপ করলেন।

পুনরায় বললাম "আপনাদের মধ্যে কতকগুলি লোক আছে যারা বিদেশীর প্রতি ফরাসী ভাষা চাপিয়ে দিয়ে চায় সেজন্য বিদেশীরা ইচ্ছা করেই আপনাদের ভাষা পরিত্যাগ করছে যেমন আমি এক জন। আমাকে ফরাসী ভাষা বলাবার জন্য অনেকে বিপদ ফেলতেও ত্রুটি করে নি। ফল হয়েছে একটি ফরাসী ভাষা না জেনেও ইউরোপ ভ্রমণ করতে সক্ষম হয়েছি। কারো উপর যদি কিছু চাপাতে হয় তবে শক্তির অপব্যবহার হয়।"

হাঁ মঁসিয়ে।

গাড়ি থামল। আমরা সবাই নামলাম। সাইকেলটা ব্রেকভান্ হতে নিয়ে অন্যান্য ইংলিশ যুবকদের সংগে চল্লাম। পথে দেখা হল এক দল ফরাসী ভ্রাম্যমানদের সংগে। তাদের সংগে বৃটন যুবকদের পরিচয় ছিল। তাদের একই সংগে আমার একটি লজিং হাউসে আশ্রয় নিলাম। রাত্র থাকবার জন্য প্রত্যেকে পাঁচ ফ্রাঙ্ক করে দিলাম। বিছানা অপরিষ্কার ছিল। ঘরটা গরমও কম ছিল। বাইরে খেয়ে বিছানায় বিশ্রাম করার

সময়ই বুঝলাম উকুনের উপদ্রব আছে। বিছানার চাদর, বালিশের খোল পরিবর্ত্তন করে দিতে বললাম। লজিং হাউসের মালিক তাড়াতাড়ি করে বিছানার চাদর এবং বালিশের খোল পরিবর্তন করে দিল। সে বুঝতে পারল একটি কালো লোকের আদেশ অনেকগুলি শ্বেতকায় মেনে চলছে নিশ্চয়ই বোধ হয় লোকটা কেউকেটা হবে।

অহঙ্কার করার মত আমার কিছুই ছিল না। রাত্রে সুনিদ্রা যাতে হয় তাই আমার লক্ষ্য। সন্ধ্যার পর থেকেই বৃষ্টি, সেই সংগে প্রবল বাত্যা বইতে আরম্ভ করেছিল। শীতের প্রকোপ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। বিছানায় শুয়া মাত্র ঘুম হয়েছিল। আশা করছিলাম পরের দিন সকালে সূর্য্য দেখতে পাব কিন্তু সকালও সেই একই রকমের বৃষ্টি হওয়াতে কিছুই ভাল লাগছিল না। সাগরতীরে একটু বেড়িয়ে আসব তারও সুযোগ ছিল না। ইংলিশ এবং ফরাসী যুবকেরা বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সকলকে বিদায় দিয়ে লজিং হাউসে বসে থাকলাম। কে যাবে এই বৃষ্টির মধ্যে ?

সাগর তীরের ডেপী সহরে হঠাৎ সূর্য্য দেখা দিল। বাইরে গেলাম। সামনেই এক খানা বসবার স্থান। অনেকেই বসেছে, আমিও বসলাম। আমার মন ভাল ছিল না। প্যারী হতে ডেপীতে এসে কিছুই ভাল লাগছিলাম না। সাইকেল চালাবার সুযোগ ছিল না। সর্বদাই কর্মরত শরীর বোধ হয় বেশী বিশ্রাম চায় না। অলস হয়ে শুয়ে থাকার জন্যই এই অবসাধ। অবসাধ অপসরনের জন্য রৌদ্রে বসলাম। কাছে বসা কয়েক জন ফরাসীর সংগে কথা আরম্ভ হল।

বিকালে দিনটাও একটু ভাল করল। সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলাম। অসংখ্য নরনারী সমুদ্রতীরে আনন্দের সহিত বেড়াতে ছিল। এমন অনেক যুবতী দেখলাম যারা বাস্তবিকই সুন্দরী কিন্তু তাদের পেছনে দুষ্ট

চরিত্রের কোন যুবক কোনরূপ অপ্রতিকর কাজ করছিল না। নিগ্রো, আরব, সোমালীও ছিল, তারাও ভদ্রভাবেই পথ চলছিল। নিগ্রোদের স্বভাব স্বভারতই নরম, তাদের বিরুদ্ধে বলার মত কিছুই থাকতে পারে না কিন্তু আরব এবং সোমালীরা কিরূপে সভ্যতা বজায় রেখে চলছিল তাই ভাবছিলাম।

নেপোলিয়নের ধরণে হাঁটছিলাম দেখে অনেকেরই দৃষ্টি আমার উপর পড়েছিল। অনেকে প্রশ্নও করছিল কিন্তু ফরাসী ভাষা জানতাম না সেজন্য কোন কথার জবাব দেই নি। অনেক বৎসর ক্রমাগত বাইসাইকেল চড়ার জন্য পা ফাঁক করে চলতে হচ্ছিল। নেপোলিয়নও নাকি পা ফাঁক করে হাঁটতেন।

বিকালে কতকগুলি ফরাসী যুবকের সংগে সাক্ষাৎ হয়। তাদের প্রত্যেকেই ইংলিশ বলতে পারত। তাদের পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছিলাম। নিকটেই একটি ক্লাব ঘরে আমার ভ্রমণের সংক্ষেপ বর্ণনা দেবার পর স্পেন সম্বন্ধে অনেকেই প্রশ্ন করে। স্পেণে অতি সত্বরই যুদ্ধ আরম্ভ হবে সে সংবাদ আমি রাখি কি না জিজ্ঞাসা করেছিল। যখন জানল আমি স্পেন সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখি না তখন তারা দুঃখিত হয়ে বলেছিল "স্পেনের কাছে এসেও স্পেনের সম্বন্ধে কোনও সংবাদ রাখেন না বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় নয় কি?

কি আর করি, নিজের দোষ স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না। তখনও স্পেনে যুদ্ধ বাধবে আমি কেন কোনও ভারতবাসীই জানত না, অথচ ফরাসী ক্লাবের বেকার সভ্যরা স্পেনের আভ্যন্তরিক সংবাদ রাখত। স্পেন তাদের নিকটে বলেই যে সংবাদ পাচ্ছিল তা নয়। নিজের মধ্যে আলাপ আলোচনা এবং বিতর্কের মধ্য দিয়ে এসব তথ্য বের করতে সমর্থ হয়েছিল। আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি, আমার মনে হয়

ইণ্ডিয়াতে এমন কোনও ক্লাব আছে যার সভ্য লিয়াকত আলীর সম্বন্ধে ঠিক ঠিক সিদ্ধান্তে পৌছতে পেরেছেন। বিদেশী সংবাদের ধ্বর নিয়ে নিজ নিজ মন্তব্য করেই খালাস। সাবাস অনুধাবন। আমার অজ্ঞতা বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়েছিলাম। তাদের কাছে ীয় মহাযুদ্ধ আবস্ত হলে তারা কি করবে জিজ্ঞাসা করাতে সকলেই বাক্যে বলেছিল, যুদ্ধক্ষেত্র হবে আমাদের দেশ, যুদ্ধ করব আমরা বৃটিশ তার ফল ভোগ করবে এবার তা হবে না, আমরা যুদ্ধ করব আমাদের দেশে যুদ্ধক্ষেত্র হতে দেব না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাই হয়েছিল। ফরাসীরা তাদের দেশ যুদ্ধক্ষেত্রে ণত হতে দেয় নি। ফ্রান্সে ভিসি সরকার গঠন হবার পর বেকারদের ফলবতী হয়েছিল বুঝতে পেরেছিলাম।

অতীত গত হয়েছে, আসছে যা তার কথা বলাই ভাল। তৃতীয় দ্ধ হবার সম্ভাবানা রয়েছে। চীন এবং সোভিয়েট রুশ গঠনমূলক ঙ্গ ব্যস্ত, যুদ্ধ তাদের পরিপন্থি, তা বলে আমেরিকা যুদ্ধ এড়াতে র না। আমেরিকার ধনীদেরও "যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ" মেনে ত হবেই, অতএব যুদ্ধ তাদের দরকার। কিন্তু এবারের যুদ্ধে অর্থাৎ র মহাযুদ্ধে ফরাসীরা আমেরিকান্‌দের তাবেদারী করবে না। যুদ্ধের সেই ফরাসীরা আমেরিনদের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং ফরাসী দেশে আমেরিকান থাকবে প্রত্যেককে আটক করবার চেষ্টা করবে। ফলে গৃহ যুদ্ধ। তৃতীয় মহাযুদ্ধের ফলাফল এখনই বলা যেতে পারে। এক য়া এবং রেস্ট অব্ ইণ্ডিয়া ছাড়া প্রত্যেক দেশেই সিভিল ওয়ার ম্ভ হবে।

এসব হল প্রিডিক্‌সন্। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বের অভিজ্ঞতা নিয়ে ক্লাব সভ্যদের কথার উপর নির্ভর করে পূর্বে যা বলা হয়েছে ছ ষ্যতের তৃতীয় মহাযুদ্ধের ইতিহাস তেমন নাও হতে পারে।

ডেপীতে জাহাজে উঠার সময় ক্লাব বয়দের সংগে করে নিয়ে ছিলাম এবং জাহাজে উঠেই প্রত্যেককে এক কাপ করে চা উপহার দিয়ে বলছিলাম এই যে চা খাচ্চ বন্ধুগণ এই চা আমাদের দেশ থেকে বৃটিশ ব্যবসায়ীরা কিনে আনে। ভারতের চা এক জন ভারতবাসীর কাছ থেকে উপহার পেয়ে ফরাসীরা সুখী হয়েছিল।

জাহাজ ছাড়ল, তীর হতে বন্ধুরা রুমাল উড়াতে থাকল, আমিও রুমাল উড়ালাম বটে কিন্তু চিন্তা করে দেখলাম, রুমাল উড়ানো শোক বিলোপের একটি অস্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। বৃটিশ, ফরাসী এবং অন্যান্য সমুদ্র উপকূলবাসীরা প্রায়ই সমুদ্রে যায় এবং দুর্ঘটনায় অনেকে মরে। সেইজন্যই সমুদ্র যাবার পূর্বে অনেকে মনে করে হয়ত আর ফিরেও না আসতে পারে সেইজন্যই রুমাল উড়বার ব্যবস্থা !

শেষ

ভূপর্য্যটক শ্রীরমানাথ বিশ্বাসের অন্যান্য প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ভ্রমণ গ্রন্থাবলী

গ্রন্থ	সংস্করণ	মূল্য
মালয়েশিয়া ভ্রমণ	১ম সংস্করণ	৩৸০
সর্বস্বাধীন শ্যাম	১ম "	২॥০
ভিয়েতনামের বিদ্রোহী বীর	১ম "	২॥০
মরণ বিজয়ী চীন	৩য় সংস্করণ	৬৲
কোরিয়া ভ্রমণ	৩য় "	১৲
জুজুৎসু জাপান	১ম "	৩৲
প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তি	২য় "	১॥০
বেতুইনের দেশে	২য় "	১।০
তরুণ তুর্কী	৪র্থ সংস্করণ	২৲
বিদ্রোহী বলকান	১ম "	৩॥০
জার্মানী এবং মধ্য ইউরোপ ভ্রমণ	১ম "	৩॥০
পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ	১ম "	২৲
ভয়ংকর আফ্রিকা	২য় সংস্করণ	২॥০
অন্ধকারের আফ্রিকা	১ম "	২॥০
নিগ্রো জাতির নূতন জীবন	১ম "	২॥০
দুরন্ত দক্ষিণ আফ্রিকা	১ম "	৩৸০
আজকের আমেরিকা	৪র্থ সংস্করণ	৩৲
ভবঘুরের গল্পের ঝুলি	২য় "	১।০
ভবঘুরের ভিনদেশী বন্ধু	১ম "	১।০

উপন্যাস

হলিউডের আত্মকথা	১ম সংস্করণ	৩॥০
আমেরিকার নিগ্রো	১ম „	২৲
সাগর পারের ওপারে	১ম „	২৸০

ভ্রমণ কাহিনী

ভবঘুরের বিলাত যাত্রা	২য় „	১॥০
ভবঘুরের বিশ্বভ্রমণ	১ম „	৩॥০
China Defies Death	1st. Edition	Rs. 3/-